সোনার বাংলা গ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প

পরিবেশক

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী,
২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

চিত্রশিল্পী—শ্রীচারু রায় ও শ্রীসুধেন্দু রায়।

—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়,
চলন্তিকা প্রেস,
২, রানী দেবেন্দ্রবালা রোড, পাইকপাড়া, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

দাম—~~২~~, ২॥০ (সচিত্র), ৩ (শোভন)।

4071

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিয়োগী প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে 'সোনার বাংলা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্ভূত 'ছোটদের বঙ্কিম—আনন্দমঠ', 'ছোটদের বঙ্কিম—দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি প্রথম প্রকাশ করেন। তখনই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু শিশিরবাবু যেন সে যুগ হইতে কিছু অগ্রবর্তী ছিলেন—আর সেই কারণেই বোধ হয় বইগুলি তখন তেমন প্রচার লাভ করে নাই। যাহা হউক, তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে; নানাদিকের নানা পরিবর্তনের সহিত ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যেরও অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানের ছোটরা এ বিষয়ে তাহাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। এই সময়ে শিশিরবাবুর পুনরায় 'ছোটদের বঙ্কিম'-এর নূতন সংস্করণ এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো আরো গল্প' ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। বইগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রধানতঃ ছোটদের জন্য রচিত হইলেও বড়রাও ইহা পাঠ করিলে কম আনন্দ পাইবেন না। এই শ্রেণীর বই এত সতর্কতা, নিষ্ঠা ও দরদের সহিত সম্পাদিত হইতে পূর্বে আমরা দেখি নাই। সকল বইগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস
(সম্পাদক, শনিবারের চিঠি)

১৮।৭।৫৬

নিবেদন

পঁচিশ বৎসরের উপর হইবে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সংক্ষিপ্ত করিয়া 'সোনার বাংলা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত 'ছোটদের বঙ্কিম—আনন্দমঠ', 'ছোটদের বঙ্কিম—দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি প্রথম প্রকাশ করি। তখন উহা সুধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হইলেও যথোচিত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। শুধু এই বইগুলিই কেন, অন্যান্য উৎকৃষ্ট বইও তখন যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বোধ হয়, দেশের তৎকালীন অবস্থাই উহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যাহা হউক, এই সকল পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের পক্ষে তখন যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা এখন অনেকটা দূর হইয়াছে—সেজন্য পুনরায় এই প্রচেষ্টা। ইহা সফল হইলে, ক্রমশঃ আরও অনেক কিছু সম্ভব হইতে পারে। এই শ্রেণীর সাহিত্য যত প্রকারে যত বেশী প্রচারিত হয় ততই ভাল।

কোন স্নেহভাজন বিশিষ্ট প্রকাশক 'ছোটদের বঙ্কিম' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প' ইত্যাদি প্রকাশ করিবার সদিচ্ছায় ইহার কোন কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর বহুদিন মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখন 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প' কোনক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। গত

কয়েক বৎসর কলিকাতায় এবং দেশের প্রায় সর্বত্র নানারূপে যে বিপর্যয় চলিয়াছে, তাহাতে অধিক কিছু বলিবার নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজটি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—গোঁজামিল দিয়া বা যা-তা করিয়া কাজ সারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব এবং ভাষাও যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে। তথাপি ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা রহিয়াছে, সাহিত্যামোদীদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলে, তাহা পরবর্তী সংস্করণে দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ইতি—

কলিকাতা,
১৭ কার্তিক, ১৩৫৬ সন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী

সূচি

ওঁ

শ্রীমতী মায়া দাশগুপ্তা

ও

শ্রীমতী মমতা নিয়োগী

কল্যাণীয়াসু—

আশীর্বাদক—বাবা

চন্দ্রশেখর

১

ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া কিশোরবয়স্ক প্রতাপ ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া আট বৎসরের বালিকা শৈবলিনী নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল। মাথার উপরে পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী তাহার অনুকরণ করিয়া আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গনিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। — নৌকা গন। কয়খানা নৌকা যাইতেছে? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গনিতে জানিত না, একবার গনিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গনিয়া একুশ-খানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একখানা নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে, কোথা যাইবে? কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে।...

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। শৈবলিনী মনে মনে জানিত, 'প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে।' প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা।

শৈবলিনী রূপসী, কিন্তু দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। প্রতাপও দরিদ্র। শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। দুইজনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই-

জনেই পটু। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।" শৈবলিনী বলিল, "আর কেন, এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। তাহার ভয় হইল, ভাবিল—'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?' কূলে ফিরিয়া আসিল।...

অনতিদূরে একখানি পানসি বাহিয়া বাইতেছিল। প্রতাপ ডুবিল দেখিয়া, নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্মা লাফ দিয়া জলে পড়িলেন এবং তাহাকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন। প্রতাপের মাতা ছাড়িলেন না, আতিথ্য-স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।

চন্দ্রশেখরের বয়স বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া এ পর্যন্ত দার-পরিগ্রহ করেন নাই। শৈবলিনীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর বিমুগ্ধ হইলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্তত করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পরে ক্রমে আট বৎসর কাটিয়া গেল।

২

বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব মীর কাশেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বাস করেন। একদিন দুর্গমধ্যে অন্তঃপুরে নবাবের সহিত তাঁহার প্রিয়তমা বেগম দলনী বিবির নিভৃতে অন্যান্য কথার পর এইরূপ আলাপ হইতেছিল—

দলনী। শুনিতেছি, ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবে। আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?

নবাব। আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব।

হয় তো প্রাণে নষ্ট হইব। কিন্তু আমার আর উপায় নাই।—ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু তুমি আমাদের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব?

দলনী। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে।

নবাব। কি?

দলনী। আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?

নবাব। কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে নাকি?

দলনী অপ্রতিভ হইলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। নবাব তখন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও?"

দলনী। আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।

মীর কাশেম অস্বীকৃত হইলেন।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "জাহাঁপনা, আপনি গনিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?"

নবাব তাহা গণনা করিয়া দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীর মুনশীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরোয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি আমাকে গণনা শিখাইয়াছেন—তাঁহাকে ডাকাইয়া গনাইতে হইবে যে, যদি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবেন?"

মীর মুনশী তাহাই করিল।

৩

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কাল ছায়া-সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সেই অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী ও সুন্দরী কলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। সহসা শৈবলিনী অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া দেখাইল। সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে এক তালবৃক্ষতলে একজন গোরা দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দরী কোন কথা না বলিয়া কলস ফেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া বসিয়া রহিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে জলের নিকট আসিয়া বলিল, "হম্ again আয়া হায়।"

শৈব। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ। যম! John you mean? হম্ জন নহি, হম্ লরেন্স।

শৈব। ভাল, একটা ইংরেজী কথা শিখিলাম—লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল-কলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নিবিষ্টচিত্তে একখানা হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতেছিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না দেখিয়া, শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল—বলিল, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!" তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "কেন বকিব?"

শৈব। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।

চন্দ্র। বটেও তো—এখন এলে নাকি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈব। একটা গোরা আসিয়াছিল। ভয়ে একগলা জলে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না।" এই বলিয়া আবার পুঁথিতে মনোনিবেশ করিলেন।

অল্পরাত্রে শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্নব্যঞ্জন তাঁহার নিকট রাখিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল। ক্রমে রাত্রি অত্যন্ত গভীর হইল। তখনও চন্দ্রশেখর পাঠে নিবিষ্ট।

৪

পরদিন প্রাতে মীর মুনশীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। সুতরাং তিনি মুরশিদাবাদ গেলেন।

চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতে রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে ডাকাতি হইল। বাড়ী লুঠিয়া ডাকাতেরা একখানি শিবিকায় করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেল। শিবিকার সঙ্গে বেদগ্রামের সন্নিকটবর্তী পুরন্দরপুরের রেশমের কুঠির সাহেব—লরেন্স ফষ্টর।

ফষ্টর শৈবলিনীকে লইয়া ভাগীরথীর তীরে আসিলেন। সেখানে বড় একখানা নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস-দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিলেন। ফষ্টর নিজে একখানা ছোট নৌকায় কলিকাতা রওনা হইলেন। তাঁহার জরুরী কাজে শীঘ্র সেখানে যাওয়া প্রয়োজন—বড় নৌকায় গেলে দেরী হইবে। তিনি পরে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাইবেন।...

বায়ু প্রবল। শৈবলিনীর বড় নৌকা প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরাটির ভদ্রহা ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী পরা—হাতে আলতার চুপড়ি। সে নৌকায় আসিয়া শৈবলিনীকে আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী তাহাকে দেখিয়াই চিনিল—সে সুন্দরী। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে ভগিনী—শৈবলিনীর সখী। সুন্দরী বলিল, "আমি একলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গি একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আলতার চুপড়ি নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না।"

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর তোমার দশা ?"

সুন্দরী। আমার জন্য ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই, যে সুন্দরী-বাম্‌নীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার স্বামী ধর্মাত্মা, তিনি অবশ্য তোমাকে গ্রহণ করিবেন। কিছু কলঙ্ক ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।

কিছুটা চন্দ্রশেখরের অমনোযোগে এবং অনেকটা শৈবলিনীর বুঝিবার ভুলে শৈবলিনীর মনে স্বামীর প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে নাই। তাই শৈবলিনী বলিল, "কোন্ সুখের আশায় আর ঘরে ফিরিয়া যাইব ? তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—তুমি ফিরিয়া যাও, আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও।"

তখন সুন্দরী বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

৫

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গনিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গনিতে পারিলাম না। সকল কথা গণনায় স্থির হয় না।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন।...

চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, শৈবলিনী গৃহে নাই। তিনি সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসী-দিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাই-লেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন। বহুযত্নে সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয়মাত্র গ্রহণ করিয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

৬

দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম তাঁহাকে বলিল, "ইংরেজের হাতিয়ার-বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। উহা আজিমাবাদের (পাটনার) কুঠিতে যাইতেছে। গুরগন খাঁ বলেন যে, শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। তিনি কিস্তি আটক করিতে চাহেন। তাহাতে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। বুঝি নবাব সিরাজদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে।"

শুনিয়া দলনী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া একটি দুঃসাহসের কাজ করিলেন। তিনি কুলসমকে দিয়া গুরগন খাঁর নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালায় যে-সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগন খাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমানী। তিনি পূর্বে একজন সামান্য বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করিলেন। কামান-বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা বিলাতী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীর কাশেম কোন কর্ম করিতেন না। ফলতঃ গুরগন খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পরিচারিকা কুলসমকে সঙ্গে লইয়া, দলনী বেগম রাত্রে গোপনে গুরগন খাঁর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ কথা কি সত্য? আপনিই নাকি এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন?"

গুর। হয় হউক না যুদ্ধ, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি?

দলনী। আমার মনে হইতেছে যে, এ যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।

বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিলেন।

গুরগন খাঁ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীর কাশেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাশেম আমার স্বামী? তুমি নিপাত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম— অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও ভালই, নহিলে আজি হইতে এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

গুরগন খাঁ বুঝিলেন যে, দলনী এখন আর তাঁহার নহে, সে মীর কাশেমের হইয়াছে। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলপ্রার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে।

গুরগন খাঁ দ্রুত একজন শস্ত্রবাহক ভৃত্যের দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

৭

দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না!"

সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে, প্রভাতে তাঁহাদিগকে ধরিয়া নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। নবাব যদি তাঁহাকে বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরণকালে তাঁহাকে বলিতে পারিবেন যে, তিনি নিরপরাধিনী।

এই সময়ে এক ব্রহ্মচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া দলনী ও কুলসমকে একটি ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় দলনী আত্মপরিচয় দিয়া রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তথাপি যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।"

ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে, সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।—আমি পত্র পাঠাইয়া দিব।"

ব্রহ্মচারী কাগজ-কলম দিলেন। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।" অগত্যা দলনী তাহাই স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্মচারী ভৃত্যকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি রাজকর্মচারীদের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে মানিত। সূর্যোদয়ের পর তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুনশী রামগোবিন্দ রায়ের হস্তে দলনীর পত্র দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুনশী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুনশী কিছুই জানিলেন না।

৮

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠানো আবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত

হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে, চন্দ্রশেখর নবাবের শিক্ষাদাতা, তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিনে দিনে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এখন প্রতাপ জমিদার। তাহার বৃহৎ অট্টালিকা ও দেশবিখ্যাত নাম।

প্রতাপ ফষ্টর-কর্তৃক শৈবলিনী-হরণের সংবাদ শুনিয়া, ভৃত্য রামচরণকে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা। ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর।

৯

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্মচারীকে সেখানে পাঠানো আবশ্যক। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।—ফষ্টর সেই কার্যের জন্য নির্বাচিত হইলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন এবং আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতা আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ-সকল বৃত্তান্তের সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর

পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন। অন্তের নৌকা এবং শৈবলিনীর বজরা—দুইখানি-ই যথাসময়ে মুঙ্গের পৌছিল।...

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নৌকা দুইখানি মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। শৈবলিনীর বজরাখানি অন্তের নৌকা হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে আছে। তাহার এক কামরায় ফষ্টর, আর একটিতে শৈবলিনী ও তাহার দাসী। ছাদের উপর একজন "তেলিঙ্গা" প্রহরী বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। এমন সময় তীরের একটা কশাড়বনের অন্তরাল হইতে প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ বন্দুকের গুলিতে সেই প্রহরীকে আহত করিল। প্রহরী আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া ফষ্টর বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে চারিদিক্ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রামচরণের গুলিতে আহত হইয়া প্রহরীর ন্যায় তিনিও গঙ্গাস্রোতমধ্যে পতিত হইলেন। প্রতাপ পূর্বেই স্নান করিবার ছলে জলে নামিয়া বজরার অন্ধকার ছায়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে একখানা ছুরিকার দ্বারা বজরার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া, বজরায় উঠিয়া, আহত প্রহরী ও ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুক তুলিয়া লইলেন এবং তাহা প্রদর্শনে মাঝিদিগকে নৌকা বাহিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। এত দ্রুত এই সকল ঘটনা ঘটিল যে, অপর কেহ বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া সাহায্যার্থ আসিবার পূর্বেই বজরা দূরে বাহির জলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে বজরা আসিয়া এক চরে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামচরণ কয়েকজন লাঠিয়াল ও একখানা শিবিকাসহ সেখানে আসিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেল। প্রতাপ রামচরণকে পালকি জগৎ শেঠের গৃহে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অসুবিধাজনক বোধে রামচরণ শৈবলিনীকে প্রতাপের বাসায় আনিয়া হাজির করিল।

পালকি চলিয়া গেলে প্রতাপও নৌকা হইতে নামিয়া বাসায় আসিলেন। রামচরণ শৈবলিনীকে সেখানে আনিয়াছে শুনিয়া প্রতাপ কিছু

বিরক্ত হইলেন। শৈবলিনীর সহিত দেখা হইলে, সে প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে? আমাকে মারিয়া ফেলিলে না কেন? আমার এ দুর্দশা কাহার হ'তে?—তোমার হ'তে। কাহার জন্য আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না?—তোমারই জন্য।"

প্রতাপ কহিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি জান না যে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় আমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময় বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।—সন্ধান পাইয়া আমিয়ট দুইজন ইংরেজ ও কয়েকজন সিপাহী পাঠাইয়াছেন। তাহারা বলপ্রয়োগে কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং একরূপ সম্মুখেই প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিতে পাইল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। ইংরেজেরা প্রতাপ ও রামচরণকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগে দলনী জাগরিত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি কক্ষদ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিলেন। শৈবলিনী মনে করিয়া ইংরেজেরা কুলসম সহ তাঁহাকেও লইয়া গেল।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনী একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল। সে শয্যোপরি বসিয়া নানা চিন্তায় নিমগ্ন হইল। কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। কত কি মনে পড়িল!—কিছুক্ষণ পরে শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়াও সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া

সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল। দেখিল, চন্দ্রশেখর !

১০

এ দিকে যথাসময়ে চন্দ্রশেখর-প্রদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল, নবাব জানিলেন, দলনী প্রতাপের বাসায় আছে। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য সেখানে শিবিকা প্রেরিত হইল। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।—শৈবলিনী শুনিল, তাহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। সে আপত্তি না করিয়া শিবিকারোহণ করিল। খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া, অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, সে দলনী নহে। যাহা হউক, নবাব শৈবলিনীর নিকট জানিতে পারিলেন যে, দুইজন ইংরেজ দলনী বেগম ও কুলসমকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রতাপ ও তাঁহার ভৃত্য রামচরণকেও তাহারা সেই সঙ্গে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী প্রতাপকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার উদ্ধারের জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া নবাব বাহিরে গেলেন।

নবাব গুরগন খাঁকে ডাকাইয়া আনিয়া, আমিয়টকে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। গুরগন খাঁ বলিলেন যে, আমিয়ট সেই দিন দুই প্রহরে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নবাব মনে মনে গুরগন খাঁর প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তার পর নবাব মীর মুনশীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "মুরশিদাবাদে দ্রুত মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরোয়ানা পাঠাও যে, আমিয়টের নৌকা সেখানে পৌছিবামাত্র তাহাকে আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে-কৌশলে কার্যোদ্ধার করিতে লিখিবে।"

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ ও সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিলে, শৈবলিনীর সাক্ষাতে তাহাকে বলিলেন, "ইঁহাকে এবং একজন হিন্দু বাঁদীকে সঙ্গে লও। একখানি দ্রুতগামী ছিপ লইয়া এখনই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে।"

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

১১

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। সেই চরে আমিয়টের বজরা বাঁধা রহিয়াছে। অকস্মাৎ সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া স্ত্রীকণ্ঠে বিকট ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ? কেন কাঁদিতেছ ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট তখন হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—শৈবলিনী। শৈবলিনী পাগল সাজিয়াছে।

বজরায় আসিয়াও শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট একজন বাঙ্গালী খানসামাকে ডাকিয়া শৈবলিনীর সহিত কথা কহিতে বলিলেন। খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন ?" শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবকে বলিল, "পাগল।"

সাহেব বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায় ?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে।" কিন্তু কিছু পরে বলিল, "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে ; তোমাদের ছোঁয়া খাব কেন ?" খানসামা সাহেবকে এ কথা বলিল।

সাহেব বলিলেন, "যদি কোন ব্রাহ্মণের ভাত থাকে, দিতে বল।"

একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী ছিল: তাহার ভাত ছিল না। কয়েদী প্রতাপ ব্রাহ্মণ। খানসামা শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকায় লইয়া গেল। বলিল, "একটি মেয়ে উপবাসী আছে। দু'টি ভাত দিতে পার?"—প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।" হাতকড়ি খুলিয়া দিলে, প্রতাপ মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে শৈবলিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ শৈবলিনীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া তিনিও জলে ঝাঁপ দিলেন। কয়েদী ভাগিতেছে দেখিয়া সান্ত্রী প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন। প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সন্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব?" শুনিয়া সিপাহী বন্দুক নত করিল এবং আর কেহও প্রতাপের অনুসরণ করিল না।

সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক দূর যাইয়া শৈবলিনী বলিল, "চল প্রতাপ, তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

শৈ। কেন প্রতাপ? কি চাও তুমি? যা বল, তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, আজি হইতে আমাকে ভুলিবে।

সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, প্রাণান্তকর—তথাপি

প্রতাপের প্রাণরক্ষার জন্য শৈবলিনী সে শপথ না করিয়া পারিল না। তখন প্রতাপ গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে তীরে উঠিল। পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। শৈবলিনীর ছিপ নিকটেই ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এ দিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্তী হইল, কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

গোলযোগের সুযোগে রামচরণও কাহাকে কিছু না বলিয়া, নৌকা হইতে নামিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে সামান্য ভৃত্য—ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না।

১২

প্রতাপ ও শৈবলিনীকে লইয়া ছিপ শেষরাত্রে নদীর তীরে একটি নিভৃত স্থানে লাগিল। সেই সময়ে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইল। অভিপ্রায়, প্রতাপের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে—যেন প্রতাপ আর তাহার সন্ধান করিতে না পারেন। এ জন্য যতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, তাহার নিকট উপনীত হইয়া রাত্রিযোগে বহুকষ্টে অল্পদূরমাত্র আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া সব কিছু ঢাকিয়া ফেলিল। শৈবলিনী হতাশ হইয়া এক কণ্টকবনে উপবেশন করিল। অতি ভয়ঙ্কর, অতি গম্ভীর মেঘগর্জন আরম্ভ হইল, বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। শৈবলিনীর মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষিত হইতে থাকিল।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র।

শৈবলিনী শীতে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যে, বুঝি আর সূর্যোদয়ও দেখিতে পাইবে না—মৃত্যু অতি নিকট।

এমন সময়ে এক মহাকায় পুরুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। পরে তাহাকে এক মহান্ধকারময় পর্বতগুহায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই মহাকায় পুরুষ চন্দ্রশেখর। গুরু রমানন্দ স্বামীর নির্দেশক্রমে শৈবলিনীর রক্ষার্থ চন্দ্রশেখর ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

১৩

ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। জীবন শৈবলিনীর পক্ষে অবহনীয়—অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—ক্রমে শৈবলিনীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তখন শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুই কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল ইতস্তত বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, সেই মহাকায় পুরুষ আবার তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সেই নদীতীরে বসাইলেন। সেখানে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্তে লৌহসূচিসকল অগ্রভাগ উর্ধ্ব করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সাঁতার দিয়া নদী পার হইতে বলিলেন। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত জ্বলন্ত লোহিত

লৌহনির্মিত বেত্রদ্বারা শৈবলিনীর পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি কুম্ভীরসকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল ; রুধির-স্রোত বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া গাত্রে লাগিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধির-স্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এরূপ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নাসিকা আবৃত করিয়াও পূতিগন্ধে উন্মত্তার ন্যায় হইল। হৃদয়বিদারক আর্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্বতবিদারণ, অশনিপতন, অগ্নিগর্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন ইত্যাদির অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দসকল এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। তখন শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়, রক্ষা কর!—এ নরক!"

স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চিৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু সে ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক কঠোর ব্রত অবলম্বন কর।"

শৈ। আমি আর কি স্বামীর দর্শন পাইব না?

উত্তর। পাইবে—দ্বাদশ বৎসর পরে—ব্রতান্তে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্বে সাক্ষাৎ পাইব না?

উত্তর। এই গুহায় সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া সরলচিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর; তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। এই সাতদিন কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া, সামান্য ফলমূল আহরণ করিয়া স্বল্পাহারে থাকিবে।

শৈবলিনী তাহাই করিল। সপ্তম রাত্রে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে চেতনা হারাইয়া শৈবলিনী পুনরায় নারকীয় দৃশ্যসকল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! তুমি প্রসন্ন হও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

সহসা শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর কূজন শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রহিয়াছে? শৈবলিনী চিনিল, চন্দ্রশেখর।

শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রশেখরের চরণে পতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে?—আমি রাত্রিদিন নরক স্বপ্ন দেখি।"

এইরূপ বলিতে বলিতে শৈবলিনীর বদনমণ্ডল বিশুষ্ক, চক্ষু বিস্ফারিত, শরীর কণ্টকিত হইল—সে অকস্মাৎ বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

চন্দ্রশেখর অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো! রসো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী—আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।—হ্যাঁগা, তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমাকে মারিবে না?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।...

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই-এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইও।"

চন্দ্রশেখর তাহাই করিলেন।

১৪

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি-প্রভাতে প্রতাপ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন।

অনুসন্ধানে তাহাকে না পাইয়া প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে।

প্রতাপ মুঙ্গেরে ফিরিলেন। দুর্গমধ্যে গিয়া দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? তার পর মনে ভাবিলেন, আমার যেমন শক্তি সেই অনুসারে এই কার্যে নবাবের সাহায্য করা কর্তব্য। তখন

প্রতাপ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইল।

তার পর প্রতাপ স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল।

প্রতাপ পুনর্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল প্রতাপ রায়ের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইতেছে।—শুনিয়া গুরগন খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

১৫

আমিয়ট মুরশিদাবাদে পৌছিলেন। মহম্মদ তকি খাঁ আমিয়টকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক। তখন উভয় পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে আমিয়ট এবং অপর দুইজন ইংরেজ অকুতোভয়ে লড়াই করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ দিকে রামচরণের বন্দুকের গুলিতে আহত মৃতবৎ লরেন্স ফষ্টরকেও, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিবার কালে, আমিয়ট স্বতন্ত্র এক নৌকায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। চিকিৎসায় ফষ্টর বাঁচিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি রুগ্ন ও বলহীন। মুরশিদাবাদে বিবাদ উপস্থিত হইবার পূর্বে আমিয়ট দলনী ও কুলসমকে ফষ্টরের নৌকায় তুলিয়া দেওয়াইলেন এবং তাঁহাকে নিরাপত্তার জন্য রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত ফষ্টর রেসিডেন্সিতে থাকিতেও ভরসা পাইলেন না; তিনি কলিকাতাভিমুখে চলিলেন। পরে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িতেছে না দেখিয়া, তিনি বিশেষ ভীত হইলেন। মনে ভাবিলেন, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। এইরূপ বিবেচনা

করিয়া ফষ্টর দলনীকে তীরে নামাইয়া দিলেন। দলনীও আশায় মুগ্ধ হইয়া ঐ ক্ষুদ্র নৌকা নিজামতের মনে করিয়া তীরে নামিলেন। কিন্তু নবাবের হাতে পড়িলে কপালে কি আছে বলা যায় না মনে করিয়া, কুলসম কিছুতেই নৌকা হইতে নামিল না। তখন সূর্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিলেন, সে নৌকাও নিকটে আসিল, কিন্তু ভিড়িল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন দলনী ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। নদীর অনতিদূরে দলনী বসিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। তখন এক দীর্ঘাকার পুরুষ বিনাবাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। দলনী মহাভীতা হইলেন। এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষই শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া অন্ধকারে পর্বতারোহণ করিয়াছিল।

দলনী কাঁদিতেছিলেন, ভয় পাইয়া রোদন সংবরণ করিলেন।—কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক বলিল, "তোমায় চিনি, তুমি দলনী বেগম।—এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?"

দলনী বলিলেন, "যাইব কোথায়? এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেকদূর, কে আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর—নতুবা অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিলেন, বলিলেন, "ঘটুক। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক। তবে চল। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। তিনি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন।

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিলেন।

এ দিকে মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে উদ্ধার করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। তিনি যখন দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমিয়টের প্রতি আসক্ত হইয়া খৃষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত—কলিকাতায় আমিয়টের সুহৃদগণের নিকট যাইতে চাহেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন।

১৬

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীর কাশেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগন খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। মীর কাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

সাধ্বী দলনী স্বামীর আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মীর কাশেমের ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল। সেখান হইতে তাড়িত হইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট নবাবসেনা উদয়নালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মীর কাশেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কুলসম কলিকাতা হইতে সেখানে আসিয়া নবাবের সম্মুখে হাজির

হইল। দলনী আত্মহত্যা করিয়াছেন, এইরূপ জনরব সে পথে পূর্বেই শুনিয়াছিল। এখন তাহা সত্য জানিয়া, সে আছড়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে লাগিল। তার পর কুলসম সকলের সম্মুখে দলনীর কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া মীর কাশেম তকি খাঁ, ফষ্টর, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরকে সেখানে আনিবার জন্য অমাত্যদিগকে আদেশ করিলেন।

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া, "দলনী! দলনী!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

১৭

ফষ্টরের দুষ্কার্যের কথা ওয়ারেন হেষ্টিংসের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

ফষ্টর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে হেষ্টিংস তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। সেই ক্ষুদ্রাশয় তখন উদয়নালায় আসিয়া, আপন নাম গোপন করিয়া নবাব সৈন্যদলভুক্ত হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন তাহাকে গ্রেফতার করা হইল।

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে রমানন্দ স্বামীও সেখানে আসিয়া দর্শন দিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগ করিলেন এবং যোগক্রিয়ার সাহায্যে শৈবলিনীর মুখে জানিতে পারিলেন যে, সে কেবল প্রতাপকে দেখিতে পাইবে ভরসাতেই ফষ্টরের সহিত গিয়াছিল, অন্য কোন দোষের কাজ করে নাই। বিবাহের পূর্বে সে মনে মনে প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—নচেৎ সে সম্পূর্ণ সতী। এখন সে কায়মনে স্বামীর পদসেবার জন্য লোলুপ।

এই সময়ে নবাবের প্রেরিত লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, নবাব চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে দেখিতে চাহেন। যথাসময়ে তাঁহারা

বেদগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। রমানন্দ স্বামীও তাঁহাদের সহিত গেলেন।

১৮

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে বাংলার নবাব কাশেম আলি খাঁ দরবারে বসিয়াছেন। তকি, ফষ্টর, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, কুলসম, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি সকলেই সেখানে উপস্থিত। নবাব ইতিপূর্বেই কুলসমের মুখে অবগত হইয়াছিলেন এবং এখন ফষ্টরের মুখে শুনিলেন যে, দলনী অনিন্দনীয়া। রমানন্দ স্বামীর যোগক্রিয়ায় বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ফষ্টর শৈবলিনীর সম্বন্ধে সত্যও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলে শুনিলেন, ফষ্টর সম্পর্কে শৈবলিনী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

নবাব মহম্মদ তকি ও ফষ্টরকে কটি পর্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া, তাহাদিগকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুকুর নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন।

এমন সময়ে সহসা শব্দ হইল, "ধুড়ুম্ ধুড়ুম্ ধুম্ বুম্।"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও ?"

একজন অমাত্য কাতরস্বরে বলিলেন, "আর কি ? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

রণবাদ্য বাজিল। চারিদিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী প্রভৃতিও বাহির হইলেন। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। তখন নবাব স্বীয় অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।...

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনজনে পলায়নোদ্যত মুসলমান সেনার পশ্চাদ্গামী

হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, প্রতাপ একদল সুসজ্জিত হিন্দুসেনা লইয়া ইংরেজ রণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রতাপ বলিলেন, "চলুন, আপনাদিগকে নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিয়া আসি।"—অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সে-স্থান হইতে দূরে পৌঁছাইয়া দিয়া, অশ্বে কষাঘাত করিয়া প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন, তিনি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা তাঁহার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা তাঁহার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ আপনার জীবন রাখা তিনি অকর্তব্য বিবেচনা করিলেন। তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

বীর প্রতাপ—সংযমী প্রতাপ—যথার্থ পরহিতব্রতধারী প্রতাপ অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

সীতারাম

১

পূর্বকালে পূর্ব-বাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গভর্ণর ছিলেন। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর একজন মুসলমান ফকির আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান ফকিরের বড় মান্য ছিল। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিল না। বলিল, "সেলাম শাহ-সাহেব, আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ-সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম জোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিল—সে কাজীর বাড়ীর দিকে গেল।

গঙ্গারাম কবিরাজকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই-চারিবার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন পাঁচজন স্বজাতি জুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্ণে গঙ্গারাম তাহার ভগিনী শ্রী ও প্রতিবাসিগণ সঙ্গে বাটী ফিরিতেছিল, এমন সময় দুইজন পাইক আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। গঙ্গারাম সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ-সাহেব। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর কাছে লইয়া গেল।

গঙ্গারাম কাজী-সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। পরিশেষে কাজী আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল।" যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার, তা তো হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন ?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ-সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। "তোবা! তোবা!" বলিতে বলিতে শাহ-সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। তখন পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজী-সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া তাহাকে ঘুষি, কিল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।

২

যেখানে এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সংবাদ পৌছিল। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে

গঙ্গারামের অনুজা। সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা। —শ্রী হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও।"

এই বলিয়া শ্রী বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। তাহার নিকট গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুইজনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি-ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল এবং একটি বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভিখারীর পক্ষে প্রভুর দ্বার অবারিত। অবগুণ্ঠনবতী শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। গৃহকর্তা বলিলেন, "তুমি কে?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, শ্রী কাঁদিতেছে। বলিলেন, "এতদিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ তো এত কাঁদিতেছ কেন?"

শ্রী। আজ আমার মা মরিয়াছেন। কিন্তু আজ আমার আরও একটি ভারি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

সীতারাম। আর কি বিপদ?

তখন শ্রী মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি। আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম আছেন। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ? গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।...

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড় তখন সেইখানে বাস করিতেন। তিনি টোলে ব্যাকরণ-সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত।

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতী-পারে পাঠাইয়া দিলেন।

৩

এক খুব বড় খোলা জায়গায় সহরের বাহিরে গঙ্গারামের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে দলে দলে পালে পালে লোক জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে আসিতে লাগিল। যখন সূর্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে। শেষে স্থানাভাবে দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনুমানের মত আসীন—কোথাও বাদুরের মত দোদুল্যমান হইল। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল।

কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে দুই-চারিজন লোক আছে বটে, কিন্তু তাহারা নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় জোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া, কেবল একজন স্ত্রীলোক ঊর্ধ্বমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর, এখন কিছু দেখা যায় না?"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, "না।"

স্ত্রীলোক। তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।

এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার।

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক দুই শত সশস্ত্র সিপাহী গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। তার হাতে হাতকড়ি। পিছনে খোদ কাজী, আর সেই ফকির।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি ডাল উঁচু হইয়া না উঠিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাতখানিক গিয়া ঐ ডাল দুই



ভাগীরথীতীরে কিশোর প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনী
(চন্দ্রশেখর)

ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। শ্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিম্নশাখায় উঠিয়া, সেই জোড়া ডালে যুগলচরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে দেখিল, সহসা এক অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছে। এ মূর্তিমতী বনদেবীকে দেখিয়া নিকটস্থ জনতা সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সে অনিমিষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময় চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এ দিকে দেখ! এ দিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?" শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—চিনিল, অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে সীতারাম।

এ দিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল।

সীতারাম কাজী-সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক শাহ-সাহেব ও কাজী-সাহেবকে বিনয়পূর্বক অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "এই গঙ্গারাম—বদ্‌বখত্—বেত্‌মিজ্, যাই হোক, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি; ইহার জান্ বখ্‌শিশ ফরমায়েস করুন (প্রাণভিক্ষা দিন্)।"

কাজী। সে কি?—তাও কি হয়?

সীতা। হাজার আশরফি জরিমানা দিব।—ইহার প্রাণদান করুন।

কাজী-সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজী বলিলেন, "সে-সব কিছু হইবে না।"

সীতা। দুই হাজার আশরফি দিব। আমি জোড়হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। মার খাতির!

সে কথা‌ে ড়য়া গেল। শেষে সীতারাম চারি হাজার—পাঁচ হাজার—আট হাজার—দশ হাজার আশরফি স্বীকার করিলেন। তাও না। তখন

সীতারাম জানু পাতিয়া, করজোড় করিয়া বলিলেন, "আমার তালুক-মুলুক, বিষয়-আশয় সর্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজী। এ ব্যক্তি ফকিরের অপমান করিয়াছে—প্রাণদণ্ড ভিন্ন ইহার অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া, কাজী-সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণ লইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না? দোহাই কাজী-সাহেব, আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণ দান করুন।"

কাজী-সাহেব শাহ-সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আশরফি দিতে চাহিতেছে—তাহা লইয়া এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ-সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজী। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই। মনে জানিত যে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ-সাহেবের সঙ্গে কাজী-সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া সে জোড়হাত করিয়া কাজী-সাহেবকে বলিল, "হুজুরের বিচারে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কেমন বিধান? আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজী-সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"—কাজী-সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন।

শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল। সিপাহীরা "পাকৃড়ো!—পাকৃড়ো!" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান্ অশ্বের সম্মুখ হইতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া, সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া সক্রোধে কাজী-সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?"

সীতা। আমি তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজী। বুঝিতে পারিতেছ না? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজী-সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহারই হাতে পায়ে ঐ হাতকড়ি বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এ দিকে লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল। দেখিল, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। হিন্দুরা বাছা বাছা জোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদের কাছে হটিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার্ মার্" শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।—আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিল, যাহারা এই "মার্ মার্" শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্! মার্! মার্!" গঙ্গারাম ভাবিল, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিল, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ-হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"—শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে,—"মার্! শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, আমার শত্রু মার্!" সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয় মা চণ্ডিকে!" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, যথার্থ ই চণ্ডী অবতীর্ণা। তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিল, শ্রী।

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিল, একজন ভারী লম্বা জোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিল, পশ্চাৎ আর একজন সড়কি-ওয়ালা শাহ-সাহেবের কাটামুণ্ড সড়কিতে বিঁধিয়া উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিল।

৪

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া সসৈন্যে ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলাগুলির কাছে ঢাল-সড়কি কি করিবে? নিমেষমধ্যে সেই জোয়ানের দল অদৃশ্য হইল। অল্পকালমধ্যে প্রান্তর জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম আর মূর্ছিতা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পলাইয়াছিলে, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি—ধরিয়া দিতেছি।"

সীতা। ধরিয়া তাহার উপর আর একবার চড়িয়া পলায়ন কর।—অতি দ্রুতগতি বড় নদী পার হইয়া শ্যামপুরে যাও, সেইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন। গঙ্গারাম ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া গঙ্গারামের অনুবর্তী হইলেন। শ্রী এ দিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, এখন তুমি কোথায় যাইবে?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেখানে যাইবে। তুমি সেইখানে যাও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এতদিন পরে এ কথা কেন?—যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্বস্বের অধিকারিণী—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন? তুমি যাও—আমি যাইব না।"

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।—দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী সীতারামের সহিত চলিল।...

সীতারাম নির্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এখন রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে নদীসৈকতে বসিয়া শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।—তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। এ আপনার প্রিয়জনকে বধ করিবে। স্ত্রীলোকের প্রিয় বলিলে স্বামীই বুঝায়। স্ত্রী-পুরুষে দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না;

এবং পতি প্রিয় না হইলে, তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই।'—পিতৃদেব এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, আমি তোমাকে গ্রহণ না করি।—পিতার আজ্ঞা পালনীয়। কিন্তু পিতা, মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম করা যায় না। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম —অতএব আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—"

শ্রী উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ,ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না। তুমি আমার চিরপ্রিয়—আমি এখন হইতে শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন—শ্রীর নাম ধরিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান, আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়, আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুর পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম,

তোমার ভগিনী কোথায় ?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি ?" সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। তুমি এখনই তাহার সন্ধানে যাও। আমি এই স্থানেই আছি।"

গঙ্গারাম ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্বক এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামকে সবিশেষ জানাইল।

৫

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফকিরের প্রাণবধ গুরুতর ব্যাপার। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা ফৌজদার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় ভূষণা ত্যাগ করিয়া শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর-দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাতক যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল। সীতারাম নূতন নগরীর নাম 'মহম্মদপুর' রাখিয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুটপাট করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। তোরাব খাঁ সেজন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ মহম্মদপুরের চারিপার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন এবং সুন্দরবনপথে গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্যে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন।

প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃন্ময় এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম।

কিন্তু সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহৎ কার্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।—শ্রীকে পরিত্যাগের পর সীতারাম ক্রমশঃ নন্দা ও রমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রমা বড় কোমল প্রকৃতি। বিবাদে রমার বড় ভয়। তায় উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিল যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—তিনি দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না—নন্দার নিকটে যাইতেন। দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সহিত এই বিবাদে তাহার ক্রমে সর্বনাশ হইবে। তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণ রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিছানা লইল।

রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়।

কিন্তু এজন্য যে রমাই একা দায়ী, এমন নহে, নন্দাও দায়ী; কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল-মন্দের বিচারক তাহার স্বামী। তাই

নন্দা সে-সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া প্রাণপাত করিয়া পতিসেবায় নযুক্তা। মাতার স্নেহ, কন্যার ভক্তি, দাসীর সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ-আশার আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায় সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত। "মার্! মার্! শত্রু মার! দেশের শত্রু, আমার শত্রু মার্!"—সেই কথা মনে পড়িত।

এইরূপে শ্রীর প্রতি এক উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

৬

"এই তো বৈতরণী *। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়। আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল।

"এ সে বৈতরণী নহে—যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও, তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

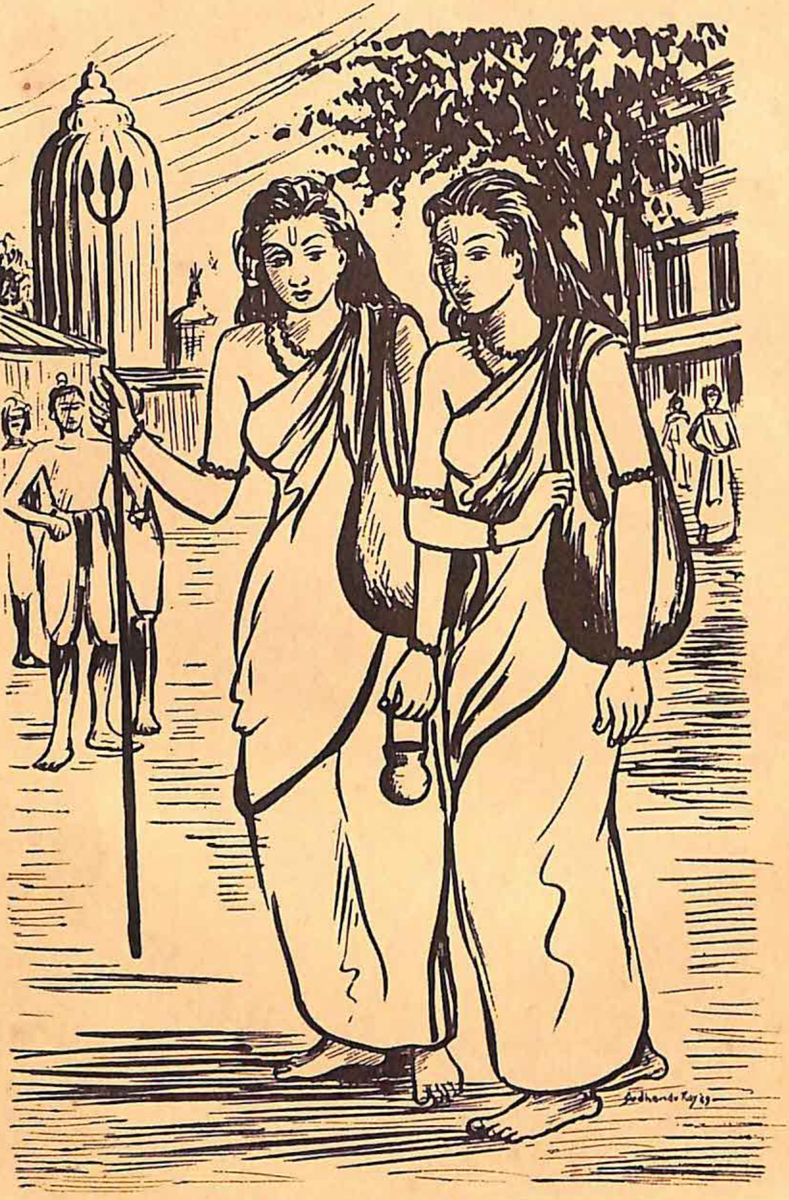
পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে?"

---

* উড়িষ্যার একটি নদী।



শ্রীক্ষেত্রের পথে জয়ন্তী ও শ্রী
(সীতারাম)

শ্রী। পারের মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই নাকি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুইজনে একত্রে যাই।

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি দিনপাত কর কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না। আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি সন্ন্যাসিনী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে?

সন্ন্যাসিনী হাসিল। বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "সে কি? আমি সন্ন্যাসিনী হইবার কে?"

সন্ন্যাসিনী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না, তাতে দোষ কি?

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই সন্ন্যাসিনী শ্রীকে আর এক সন্ন্যাসিনী সাজাইল। তার পর দু'জনে যাত্রা করিয়া, বৈতরণী পার হইয়া, সেদিন এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী আপনমনে কথোপকথন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীক্ষেত্রের পথে চলিল।

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী। সেই ললিতগিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহাটি বড় সুন্দর। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন। সন্ন্যাসিনী শ্রীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিল।

প্রত্যুষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। শ্রীও তাহাই করিল।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যাসিনী। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে।

স্বামী তখন বাহিরে আসিয়া শ্রীর বামহস্তের রেখাসকল নিরীক্ষণ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী। আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। সময়ান্তরে—আগামী বৎসর আসিও, সময় নির্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল। আবার তাহারা পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিল—"আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমাদের দু'জনেরই সমান বয়স, আমরা দুইজনে ভগিনী।—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?"

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যাসিনী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ?—কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাহাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন; তিনি তোমারও স্বামী—কেন না, তিনি সকলের স্বামী। তাঁহাকে জানিলে দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না।

জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব-বিবরণ সকল বলিল। বলিয়া শ্রী আর কথা বলিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীরও চক্ষু ছল-ছল করিল।

৭

সীতারাম স্ত্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর স্ত্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্যন্ত প্রকৃত রাজা হন নাই, কেননা, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে রাজ্য-রক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃন্ময়কে, নগর-রক্ষার ভার গঙ্গারামকে এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না; সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল যে, এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময়ে মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।—কিন্তু এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল। মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্বনাশ! রমার বুকের ভিতর টিপ্-টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৮

এ দিকে ফৌজদার তোরাব খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়।

তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিল; বলিল, "এখন ঠাকুর, কি করিতে বলেন? সহর তো ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকেও যাইতে দিবে না; যে যাইবে, তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্রশস্ত্র একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃন্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবল নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না। কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়, সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর

ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে ; তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। তখন সেখানে কাঁদাকাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবেন, বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা, তুমি সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও।"

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা, পুরুষমানুষেরা যখন বলিতেছেন, ভয় নাই, তখন ভয় কেন ?"

এই সকল কথার পর রমা বড় মূর্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া যেন মনে সাহস পাইয়াছিল।—

গঙ্গারাম নগররক্ষক। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর রমা তাহার দাসী মুরলার দ্বারা গোপনে গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

গঙ্গারাম আসিলে রমা তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই।—তা দাদা, আমি বড় ভীত হইয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর। আমার গহনা-পাতি, টাকা-কড়ি যা আছে, সব দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকেও প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজী হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।"

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী, আমি প্রাণে মরিলেও এ

কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা-ভরসা ফরসা হইল। রমা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম বলিল, "চুপ করুন! আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজী আছেন?"

রমা। যদি বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এখন তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ দেখি, আমি আসিয়া আপনাকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ লইবেন।

রমা। নিশ্বাস ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণদান করিলে। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

এ দিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এই রাজ্য আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি? টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃন্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃন্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "কি! এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে

করিতে এখনও দুই মাস কাটাইতে পারিব। ততদিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারাম কিছুই বলিল না।

৯

সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার কথা ভাবিতেই তাহার দিন গেল। রাত্রি প্রহরেকের সময় মুরলা আবার তাহাকে নিভৃত স্থানে গ্রেফতার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া রমাকে সংবাদ দিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলে নাই, সুতরাং রমা কিছু না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু গঙ্গারাম চন্দ্রচূড়ের কলকৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই প্রকাশ করিল না। মাথামুণ্ডু কি বলিল তাহা রমা বুঝিতে পারিল না। আবার মুরলা গঙ্গারামকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল—সে না গিয়া আর থাকিতে পারে না। কিন্তু এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম আজিকালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজকাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। সে এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছি-

যে, গঙ্গারামের সহিত গোপনে সাক্ষাতের অবৈধতা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। কিন্তু একদিন মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কানে লাগিল। তখন রমা মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। শেষে রমা স্থির করিল, মুসলমানের হাতে তো বাঁচিবে না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিবে না, কি লোক পাঠাইবে না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। ক্রমে গঙ্গারাম বুঝিল, এ দিকে কোন ভরসা নাই। শেষে কৃতঘ্ন গঙ্গারাম "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু রমাকে ছাড়িব না"—এই সঙ্কল্প করিল; ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম রমা ও সীতারামের সর্বনাশের উপায় স্থির করিল।...

বন্দে আলি নামে ভূষণার একজন মুসলমান মহম্মদপুরে আসিয়া বাস করিতেছিল। গঙ্গারামের অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইয়াছিল। গঙ্গারাম গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইল। বলিয়া পাঠাইল, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। প্রবঞ্চনার দ্বারা কালহরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। নগর আমার হাতে। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। তাহার কথাবার্তা আমি ফৌজদার-সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি তো ফেরারী আসামী—ফৌজদার-সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

তোরাব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন—"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"...

গঙ্গারাম ফৌজদারের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল। কাজের কথা সব ঠিক হইল। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌছিলে তো তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃন্ময়ের তাঁবে অনেক

সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। তার কি পরামর্শ করিয়াছ ?”

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর-পথ, এক দক্ষিণ-পথ। দক্ষিণ-পথে দূরে নদী পার হইতে হয়—উত্তর-পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি অর্ধেক সৈন্য দক্ষিণ-পথে, অর্ধেক সৈন্য উত্তর-পথে পাঠাইবেন। উত্তর-পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্বে যেন কেহ না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছুদূরে বনজঙ্গলমধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মৃন্ময় ফৌজ লইয়া কিছুদূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্বিঘ্ন হইবেন। মৃন্ময়ের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, “উত্তম। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?”

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিল—বলা বাহুল্য যে, সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিল।

১০

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ-পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃন্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে, মৃন্ময় সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিবেন,—যাহাতে যবন-সেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

মৃন্ময় সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিলেন। নগররক্ষার্থ অল্পমাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।…

চন্দ্রচূড়ের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। তিনি সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগররক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায় গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া কথা বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্ত চিত্তে কুশাসনে বসিয়া বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণা-গমন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। মৃন্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্বনাশ করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অনুতাপ-পীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুর-নিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে এক প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা, শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন?"

চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী। মহাপুরুষ গঙ্গাধর স্বামীর আদেশে শ্রী ও জয়ন্তী ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবীবেশে মহম্মদপুরে আসিয়াছিল।

চন্দ্রচূড়। মা, আমার সাধ্য আর কিছু নাই। নগররক্ষক নগররক্ষা করিতেছে না। শুনিয়াছি, সে তোরাব খাঁর নিকট গিয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবে।—মা, আপনি এ পুরী রক্ষা করুন।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে আমি এ পুরী রক্ষা করিব।"—এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল; চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।…

সহসা গঙ্গারাম দেখিল, দ্বারদেশে ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী মূর্তি। সাক্ষাৎ

ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া গঙ্গারাম প্রণত হইয়া বলিল, "মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা ?"

জয়ন্তী। বাছা, তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।

গঙ্গারাম। আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। আমাকে একগাড়ি গোলা-বারুদ দাও, আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। সে ইতস্তত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কে ?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, তোমার ভূষণাগমন ও সেখানকার কথাবার্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মূহূর্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমায় বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল। যেন তাহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলাবারুদ লইয়া গড়ের বাহির হইয়া যেখানে রাজ-বাড়ীর ঘাট, সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দর-কান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ি ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

সে বলিল, "আমি যে হইনা— তুমি কে ?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি, এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল। দেবতাভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি ?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও ?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব ?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

১১

চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চচূড়ায় উঠিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিলে, চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পারে এত নৌকা, এত লোক কেন ?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি ?"

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন, তথাপি বলিলেন, "শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ-ছয় শত মুসলমান সিপাহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহীসকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস

করিয়াছিলাম ? এখন সর্বনাশ হইল ! কই, সেই জ্যোতির্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কই ? তিনিও কি ছলনা করিলেন ?''—এমন সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"তবে কি এ আমাদের তোপ ?" এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেইখান হইতে ধূমরাশি উঠিতেছে। তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে গাছের তলায় একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এজন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন —কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে ? চন্দ্রচূড় এরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দিক্ শব্দিত করিল—আবার মুসলমান-সিপাহীপরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য ! ধন্য !'' বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী। তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, যে সকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্যন্ত পৌছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্নভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন এক দিকে এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান-সেনার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কান পাতা যায় না। উপর্যুপরি বজ্রের মত সেই কামান ডাকিতে লাগিল—প্রশস্ত নদীবক্ষ এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধূঁয়া উড়াইয়া

লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় দেখিতে পাইলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকা-সকল স্রোতে উলটি-পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদীস্রোত সমাকীর্ণ। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই, সে কয়খানা সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাতজোড় করিয়া উর্ধ্ব মুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজলনয়নে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নয় তো তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে।"

তখন চন্দ্রচূড় প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

১২

কামানের বন্দুকের হুড়্-মুড়্ দুড়্-মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল, "এ আবার কি! লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় তো?" গঙ্গারাম একজন জমাদারকে দেখিতে পাঠাইল। জমাদার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন সেই প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল, "মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা তো জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "তাও কি হয় মূর্খ!—তোপ কে দাগিতেছে?"

জমাদার। গাছের ডাল।

গঙ্গারাম। তুই কি ক্ষেপেছিস্? গাছের ডালে তোপ দাগে?

জমা। সেখানে কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে।

তখন গঙ্গারাম বাছা বাছা চারিজন হিন্দুস্থানীকে আদেশ করিল, "যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারিজন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। তাহারা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে গোলন্দাজ পিয়ারীলাল মরিয়া পড়িয়া আছে—আর একজন জীবিত মানুষ, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোয়ান, সর্বাঙ্গ বারুদ আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "তোম্ কোন্ হো রে ?"

সে বলিল, "কেন বাপু ?"

"কোতোয়াল সাহেবকি হুকুমসে তোম্‌কো উন্‌কা পাশ লে যায়েঙ্গে।"

তখন সে সিপাহীদিগকে বলিল, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।"—সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে—যেখানে ভীত নাগরিকগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পূরিয়া উঠিল, সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী একেবারে সহস্রকণ্ঠে গর্জন করিল, "জয় মহারাজের জয় ! জয় শ্রীসীতারাম রায় রাজাবাহাদুরকি জয় !"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন ; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সময় দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া

সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞায় কারারুদ্ধ হইল।

সীতারাম তখন সিপাহীদিগকে দুর্গ-প্রাকারস্থিত তোপ-সকলের নিকট এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কখন আসিয়াছেন? আপনার অনুচরবর্গই বা কোথায়?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলাম, ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান-সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গরক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছে না দেখিয়া, আপনার যাহা সাধ্য তাহা করিলাম।

চন্দ্র। এত গোলা-বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা, বারুদ এবং গোলন্দাজ আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা, বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন এ কয় মাসের সংবাদ বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, "এখন যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহ আমাকে দ্বাদশ ভৌমিকের

উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া, মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এখন আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অকর্তব্য। কিন্তু মৃন্ময়ের সংবাদ না পাইলে, কি কর্তব্য, কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃন্ময়ের সংবাদ আসিল। পীরবক্স খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, মৃন্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন। বিজয়ী মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ, আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া, নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"...

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী, এখন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এখন আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি।

অতএব শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

১৩

ভূষণা দখল হইল। তোরাব খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজ উপাধি গ্রহণপূর্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসনসম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা নিরপরাধিনী রমাই সকল বৃত্তান্ত

অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকী যেটুকু, সেটুকু মুরলা প্রভৃতি সকলই প্রকাশ করিল।

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্মটা করা বিধেয় নহে। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এ দিকে অভিষেকের বড় ধুম পড়িয়া গেল। দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্যগীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার দান। সীতারাম সুবর্ণ, রজত, তৈজস এবং বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দান করিয়া সীতারাম অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে, অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, রাজলক্ষ্মী-মূর্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিলেন, "মহারাজ, আমি ভিখারী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা, কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। মহারাজ, গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। কিন্তু মা, তোমাকে ভিক্ষা দেই, আমি তাহার যোগ্য নহি। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) সে কি অমূল্য সামগ্রী মহারাজ? আপনি রাজ্য পাইয়াছেন।

রাজা। যাহার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাহাই চাহিতেছি।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ?

রাজা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী।

জয়ন্তী। মহারাজ, আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বার-সকল মুক্ত রাখিবেন; আর প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হউক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

গঙ্গারাম মুক্ত হইয়া সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

১৪

জয়ন্তীর আজ্ঞামত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। নন্দা উত্তর করিল, "কই—কিছু বিশেষ হইতে তো দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও।

নন্দা বুঝিল, রাজা আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন ও রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার

নিদ্রাভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র-রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্তকুন্তলা কমনীয়া মূর্তি।

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতিব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী।

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! আমার শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্তমধ্যে আপনিই মূর্ছাভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম উর্ধ্বমুখে, অতৃপ্তদৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যেন তাঁহার আনন্দপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, 'আমার শ্রী' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, 'আমার শ্রী' নহে—এ যে স্থিরমূর্তি, মহামহিমময়ী দেবী-প্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!···

যেমন করিয়া, সর্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথা কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

সীতারাম বলিলেন, "তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ, তোমার সৌভাগ্য যে তুমি নন্দার মত মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না। যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে। —আমি সন্ন্যাসিনী।

সীতা। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সীতা। তোমাকে দেখিলেই সুখী হইব।

শ্রী। আমার এক ভিক্ষা এই, যদি আমার গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরীর মধ্যে স্থান না দিয়া একটু দূরে পৃথক্ কুটীর তৈয়ারি করিয়া দিবে। আর মহারাজ, আমাকে পৃথক্ আসনে বসিতে হইবে।

হায়! এ শ্রী তো সীতারামের শ্রী নয়!

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সীতারাম 'চিত্তবিশ্রাম'-নামক ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল; রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

রাজা বলিতেন, ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছেন, তাহার কথা। শ্রী বলিত, কত পর্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত পশু পক্ষী ফলমূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল—রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্টবোধ হইতে লাগিল, সুতরাং সীতারাম চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল।

রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া বৈকালে একবার রাজকার্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। কাজেই রাজকার্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

১৫

এ দিকে রমার রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই-এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। ঝরঝর করিয়া রমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসেন না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়া ছিল—কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দাও রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না।

নন্দা ভাবিল, "রাজাকে তো ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ-ভূত চাপিলে, এ সংসার এখন আর রাখিবে কে?" তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অদৃষ্টের কার্য প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ খুব বেশী। ডাকিনীটা যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহ জানিত না।

সীতারাম রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন। এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকেজানাইত—

বলিত, "সে বড় কাতর—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম "যাচ্ছি, যাব" করিয়া যান নাই। আজ নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল; বলিল, "আজ দেখিতে যাও, নহিলে এ জন্মে আর দেখা হইবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই আমার শেষ ভিক্ষা।"

সীতারাম কলের পুতুলের ন্যায় স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামের পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল।

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

১৬

যে দিন রমা মরিল, সেই দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখনও করেন নাই। আজ একটু ভাবিলেন, ভাবিয়া দেখিলেন, রমার দোষ বড় বেশী নয়—দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।...

সেই দিন দৈবগতিতে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া

দর্শন দিল। দ্বারবানেরা সাতপাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যে নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমি নাকি তার কারণ।"

শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "এখন উপায় ?"

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন আর তো উপায় দেখি না।

জয়ন্তী। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি—এখনই ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে? রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন।

জয়ন্তী। হইলে আমার কি করিবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারেন?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জয়ন্তী। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহি আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

১৭

এ দিকে শ্রীর পলায়নে রাজার মেজাজ এমন খারাপ হইয়া উঠিল যে, তিনি চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান, দাসদাসী এবং জয়ন্তীকে কয়েদ করিলেন আর হুকুম দিলেন, তিন দিন মধ্যে যদি শ্রীকে না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সম্মুখে জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া চণ্ডালের দ্বারা বেত মারা হইবে।...

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না। কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা।

সেই বৃহৎ দুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল দীর্ঘ বেত্র হস্তে দণ্ডায়মান আছে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

রাজার বেশভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্তকালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্করমূর্তি। রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, 'মহারাজাধিরাজকি জয়!'

সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক গৈরিক-বসনাবৃতা জয়ন্তীর অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া "জয় মায়ীকি জয়! জয় লছমী মায়ীকি জয়!" ইত্যাদি ঘোররবে জয়ধ্বনি করিল। পুরী কম্পিত হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল।

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া লইয়া বেত লাগা।"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, ক্ষমা করুন। ইঁহাকে ছাড়িয়া দিন।

—এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন ? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজা নাম ডুবিয়া যাইতেছে।”

রাজা। ঠাকুর, আপনার কাজে যাও, পুঁথিপাজি নাই কি ?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইল—জয়ন্তীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল—শেষে বেত আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

“কি !” বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন। চণ্ডাল বলিল, “মহারাজ, আমা হইতে হইবে না।”

রাজা বলিলেন, “তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।”

চণ্ডাল জোড়হাত করিয়া বলিল, “মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।”

তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, “চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।”

রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া জয়ন্তী সীতারামকে বলিল, “এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার আজ্ঞা আমি নিজেই পালন করিতেছি।” এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া আপনার প্রফুল্ল-পদ্মসন্নিভ কর-পল্লব পাতিয়া সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল। হাতে রক্তের স্রোত বহিল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

চণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্য মধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, “দোসরা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।” অনুচরবর্গ কালান্তক যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া, মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া

জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল এবং জয়ন্তীর অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তী রুধিরাক্ত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

এই সময়ে সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"মহারাণীকি জয়! দেবীকি জয়!" তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ কি এ মহারাণী! —তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই রাজপুরীর মধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?"

তখন সহস্র দর্শক এককালে "মার্! মার্!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া প্রাণমাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিলেন, "মা, অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল।"

তখন রাণী জয়ন্তীকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু না করিতে পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। মহাকোলাহলপূর্বক এবং

কে আশীর্বাদ করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু জয়ন্তী বলিল, "মা, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। কিন্তু রাজপুরীর মধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।"—নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

১৮

জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্ধান করিলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল যে, মুরশিদাবাদ হইতে নবাবী ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগরের মধ্যে বোঁচকা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

উদ্ভ্রান্তচিত্ত সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া এবার নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ্যে হাহাকারের উপর হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর কাহাকে কিছু না বলিয়াই তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।...

এ দিকে জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইয়া শ্রীর কাছে

গেল। তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান। ভগবানকে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি?—আর আমারই বা এখন কি কর্তব্য?

জয়ন্তী। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠের কর্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।

দুইজনে তখন পুনর্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৯

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেলেন। তবুও সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকী মৃন্ময় আর নন্দা। নন্দার এখন মৃন্ময়মাত্র সহায়। অতএব নন্দা কর্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন প্রাতে মৃন্ময়কে ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃন্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃন্ময় আর নাই। সে দিন প্রাতে মুসলমান-সেনার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃন্ময় নিহত হইয়াছিলেন।

মুসলমান-সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল। সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগবিলাসের শেষ, রাজ্যের শেষ, জীবনের শেষ।"—তখন রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, মুসলমান-সেনা তখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারিদিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায়

িপাহী নাই। তবে দুই-চারিজন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, াই আছে। তাহারা জোর পঞ্চাশজন হইবে।

াজা দেখিলেন, রাজকর্মচারীরা সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। ারিজন অতি পুরাতন দাসদাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণ-পরিত্যাগে কল্প হইয়া সাশ্রু-লোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন কলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে পুত্রকন্যারা বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ, এ কি করিলে!—তবে তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহুভাগ্য—আর যদি দু'দিন আগে হইতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে?"

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া যোদ্ধ্‌বেশ পরিধান করিয়া সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে মৃত্যুকামনায়

একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূলহস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষ-বিভূষিতা জয়ন্তী। তাহার পার্শ্বে সেইরূপ ভৈরবী-বেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, সেই বেশে, সেই স্থানে সমাসীন দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী সজললোচনা—কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী, তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠের কর্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।—মহারাজ, আমি তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই তোমার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আবার আমায় গ্রহণ করিবে?

সীতা। তোমায় তো বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর তো গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সীতা। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী,

আশীর্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সীতা। মা, তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তোমার আশীর্বাদে বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও?

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ।

শ্রী। মহারাজ, আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা-রমার পুত্রকন্যাগুলির রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ, নিরুপায়ের এক উপায় আছে; আপনি তাহা জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। সীতারাম মনে মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে করিতে আসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী হরিনাম করিতে লাগিল।

এমন সময় দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। শব্দ শুনা গেল —"জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"

২০

যে জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই তাহারা বাছা বাছা লোক। তাহারা অতি ত্বরা করিয়া সকলেই রণসজ্জা করিল

—আপন আপন অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালনপূর্বক অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্চনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কানে প্রবেশ করিয়াছিল।

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। দুই-চারিজন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতর নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচিব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচিমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচির রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

শ্রী ও জয়ন্তী হাসিল; বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে-মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচিব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া—

"জয় শিব শঙ্কর ! ত্রিপুরনিধনকর !
রণে ভয়ঙ্কর ! জয় জয় রে !
চক্র-গদাধর ! কৃষ্ণ পীতাম্বর !
জয় জয় হরি হর ! জয় জয় রে !"

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত মুসলমান-সেনা বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা-তরঙ্গ সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূলের ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচিব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান-সেনা ভেদ করিয়া চলিল।

কিন্তু শীঘ্রই মুসলমান সেনা 'মার্! মার্!' শব্দে গর্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাহার সিপাহীগণকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কোথাও তিলার্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্তী হইতে লাগিল। অনেকে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর একজন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচিব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান-সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান-সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচিব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। কামান দেখিয়া সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গনিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গনিল না। শ্রী, জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল।

শ্রী জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিল। জয়ন্তী ও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে, চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল। দেখিয়া শুনিয়া গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ, রক্ষা কর!"—"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচিব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। মুসলমান-সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সূচিব্যূহের পথ সাফ হইল। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

২১

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী, সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে।

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজ বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি।

এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। সেখানে তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকাচুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না —গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাহা হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক্, আইস।

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

শ্রী জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিল। জয়ন্তী ও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল। দেখিয়া শুনিয়া গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ, রক্ষা কর!"—"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচিব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। মুসলমান-সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সূচিব্যূহের পথ সাফ হইল। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

২১

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী, সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে।

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজ বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি।

এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। সেখানে তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকাচুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না —গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাহা হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক্, আইস।

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

শ্রী জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিল। জয়ন্তী ও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল। দেখিয়া শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ, রক্ষা কর!"—"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার স্থচিব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। মুসলমান-সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। স্থচিব্যূহের পথ সাফ হইল। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

২১

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী, সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে।

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজ বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি।

এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। সেখানে তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকাচুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না —গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাহা হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক্, আইস।

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

ইন্দিরা

১

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না ;—বলিলেন, "বিয়াইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া কি খাওয়াইবেন ?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত-আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম) বধূমাতাকে পালন করিতে সক্ষম। পালকি ও বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে, পুত্রের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পালকিখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী-মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারিজন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরী পালকির সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বনিয়াদী বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে, তোমাকে আর রাখিতে পারিলাম না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

তাই আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ-সাত দণ্ড রাত্রি হইবে জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্ধ ক্রোশ। পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারিপার্শ্বে বটগাছ। তথায় মানুষের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে এক-খানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোকে আসিত না। এইজন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোলজন বাহক, চারিজন দ্বারবান্ এবং অন্যান্য লোক ছিল। যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল, "আমরা কিছু জলটল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল,—

বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

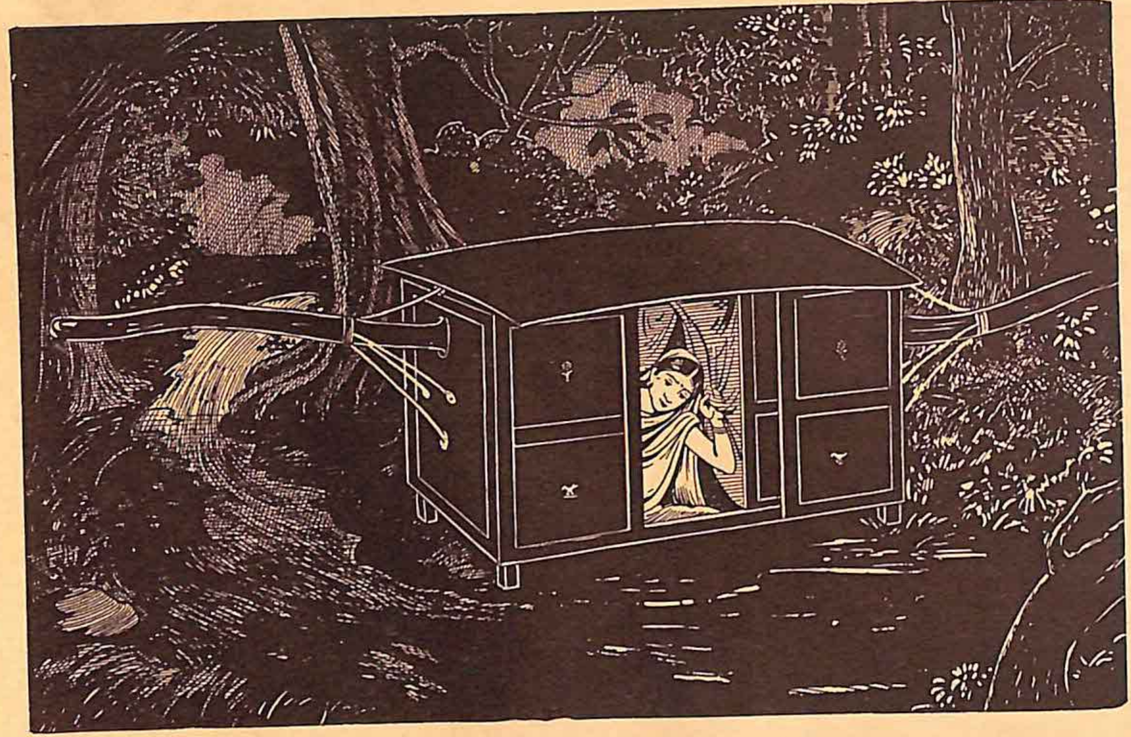
দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পালকি নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। সরোবরের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে পালকির অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম, কে একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! দেখিতে দেখিতে চারিজন প্রায় এক কালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পালকি কাঁধে করিয়া উঠাইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায় রে?" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পালকির পিছনে দৌড়াইল। কিন্তু নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া



কালাদীঘির ঘাটে বটতলায় পালকি আরোহণে ইন্দিরা
(ইন্দিরা)

পড়ি। কিন্তু একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি তো মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া আসিয়া পালকি ধরিল। তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পালকি নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার! দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া দিলাম। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্বস্ব লইয়া পালকি ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্যপশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহনীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল, "অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব?—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

তাহারা চলিয়া গেল।

২

এমন কি কখন হয়? এত বিপদ্, এত দুঃখ, কাহারও কখনও ঘটিয়াছে? অকস্মাৎ কি বজ্রাঘাত!—চক্ষুর জল কিছুতেই থামিতেছিল না,

তবু চেষ্টা করিতেছিলাম—এমন সময় দূরে একটা বিকট গর্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ-জঙ্গল, সেইখানেই সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম। আমার পায়ে অনেক কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কই, সাপে তো কামড়াইল না? আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম—আর বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়া বসিলাম। শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।···

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক-কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুকরা টুকরা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে। দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইল। সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল, ভরসা হইল, গ্রাম পাইব। অনেক পথ হাঁটিয়া, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটি গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায়? মনোহরপুরই বা কোথায়?

প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে-ঘাটে একা বেরুতে আছে? তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত

পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর ?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ, বরাবর উল্‌টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে ?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে ?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার পরনে মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড়ঘরের মেয়ে। ছোটঘরে এমন রূপ হয় না।"

ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।—আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার বস্ত্রের অবস্থা দেখিয়া দুইখানি রাঙ্গা-পেড়ে শাড়ী আমাকে দিলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত পা বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে; বসিবার শক্তি নাই। যত দিন না পায়ের বেদনা আরাম হইল, ততদিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল।

ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন, কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকেই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন। আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম।

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপদে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পেঁাছিতে পারে।" কৃষ্ণদাসবাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

৩

কলিকাতা পৌঁছিলাম। কৃষ্ণদাসবাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় কোন্ জায়গায়?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না—আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র, একজন ভদ্র লোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা

অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাসবাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতার একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কৃষ্ণদাসবাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবী আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, তাদের বাড়ীতে তোমায় চাকরানী রাখিবে।"

আমি একটা ঘরের ভিতর গিয়া কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্বে কৃষ্ণদাসবাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই সুবো এসেছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই।"

ঝি থাকিব না, না খাইয়া মরিব, সে কথা তো স্থির করিয়াছি,—কিন্তু এখন একবার সুবোকে দেখিয়া লইলাম। "সুবো" শুনিয়া আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে, "সাহেব-সুবো" দরের একটা কি জিনিস—আমি তখন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। দেখিলাম, তা নয়—একটি স্ত্রীলোক—দেখিবার মত সামগ্রী। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে। রং আমা অপেক্ষা যে ফরসা, তাও নয়। বেশ-ভূষা এমন কিছু নয়। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে —সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি, দেখিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কথার উত্তর দাও না যে—ভাব কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উনি কে ?"

গৃহিণী-ঠাকুরানী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? ও সুবো, আর কে ?"

তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয় বই কি, উনি নূতন লোক, আমায় তো চেনেন না।" এই বলিয়া সুবো আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুভাষিণী গো—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।"

তার পর গৃহিণী বলিলেন, "কলিকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। ওরা বড়মানুষ, বড়মানুষের বাড়ী তুমি কাজ-কর্ম করিতে পারিবে তো ?"

আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে—আমি বড়মানুষের বাড়ী কাজ করিতে পারিব তো ? আমার চোখে জলও আসিল, মুখে হাসিও আসিল।

তাহা আর কেহ দেখিল না—সুভাষিণী দেখিল। সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গেল। একখানা তক্তাপোশ পাতা ছিল। সুভাষিণী তাহাতে বসিল, আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, "আমার নাম না জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। তোমার নাম কি ভাই ?"

"ভাই!" যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি। মনে মনে ইহা ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আমার দুইটি নাম—একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত। যেটি অপ্রচলিত তাহাই ইঁহাদিগকে বলিয়াছি। কাজেই আপনার কাছে এখন তাহাই বলিব। আমার নাম কুমুদিনী।"

ছেলে বলিল, "কুমুডিনী।"

সুভাষিণী বলিল, "আর নাম এখন নাই শুনিলাম। কার মেয়ে, কার বউ, কোথা বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড়মানুষের মেয়ে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি— তোমার হাতে, গলায় গহনার কালি আজিও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু কিছু রাঁধিতে জান নাকি ?"

আমি বলিলাম, "জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। (মাঝখান থেকে ছেলে বলিল, "মা, আমি দাঁদি।") তবু, কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে। সে মাগীটা বাড়ী যাইবে। (ছেলে বলিল, "ত মা, বালী দাই।") এখন মাকে বলিয়া তোমাকে তার জায়গায় রাখাইয়া দিব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তার সঙ্গে তুমি দুই-এক দিন রাঁধিবে। কেমন, রাজী ?"

ছেলে বলিল, "আজি ? ও আজি।"

মা বলিল, "তুই পাজি।"

ছেলে বলিল, "আমি বাবু, বাবা পাজি।"

"অমন কথা বল্‌তে নেই বাবা !" এই কথা ছেলেকে বলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া সুভাষিণী বলিল, "নিত্যই বলে।" আমি বলিলাম, "আপনার কাছে আমি দাসীপনা করিতেও রাজী।"

"আপনি কেন বল ভাই ? বল তো মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনিও একটু খিট্‌খিটে —তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে। তা তুমি পারিবে—আমি মানুষ চিনি। কেমন, রাজী ?"

আমি বলিলাম, "রাজী না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।" আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সুভাষিণী বলিল, "চল, গাড়ী তৈয়ার। না যাও, আমি ধরিয়া লইয়া যাইব।"

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে তুলিল। আমি সুভাষিণীর পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে চলিলাম।

৪

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইলাম, তার পর এক নজর দেখিয়া লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে একটা পাটি পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি-ভরা, পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণী-ঠাকুরানী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন না কায়েত ?

ব। কায়েত।

গৃ। মাইনে কত বলেছে ?

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায় রে কলিকালের মেয়ে! লোক রাখ্‌তে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই ?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি ?"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এসেছি, তখন যা দিবেন, তাই নিব।"

গৃ। তা বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে —তোমায় তিন টাকা মাসে, আর খোরাক-পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলাম। বলিলাম, "তাই দিবেন।"...

পরদিন রাঁধিলাম। সুভাষিণী দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া সেই সময় লঙ্কা ফোড়ন দিলাম—সে কাশিতে কাশিতে উঠিয়া গেল,—বলিল, "মরণ আর কি!"

রান্না হইল, বালক-বালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর ছেলে অন্ন-ব্যঞ্জন বড় খায় না, কিন্তু সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"

সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ!"

তার পর সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। রমণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রেঁধেছে মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটি নূতন লোক আসিয়াছে।"

রমণবাবু বলিলেন, "রাঁধে ভাল।" এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন।

তার পর কর্তা খাইতে বসিলেন। বুড়া বামন-ঠাকুরানী কর্তার ভাত লইয়া গেলেন।

বামন-ঠাকুরানী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কর্তা রান্না খেয়ে কি বল্লেন?"

বামনী চটিয়া লাল; চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও গো, বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ। আমরাও রাঁধিতে জানি, তা বুড়ো হ'লে কি আর দর হয়!"

বুঝিলাম, কর্তা খাইয়া ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু বামনীকে নিয়া একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল। বলিলাম, "তা বুড়ীকে দেখিলে কার খেতে রোচে বামন-দিদি?"

দাঁত বাহির করিয়া অতি কর্কশ-কণ্ঠে বামনী বলিল, "তোমারই বুঝি রূপযৌবন থাকিবে? মুখে পোকা পড়বে না?"

এই বলিয়া রাগের মাথায় একটা হাঁড়ি চড়াইতে গিয়া পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিলে দিদি, রূপযৌবন না থাকিলে হাতের হাঁড়ি ফাটে।"

তখন ব্রাহ্মণী-ঠাকুরানী অর্ধনগ্নাবস্থায় বেড়ি নিয়া আমাকে তাড়া করিয়া মারিতে আসিলেন। আমারও রঙ্গ চড়িল। আমি বলিলাম, "দিদি, থামো। হাতে বেড়ি থাকিলেই ভাল।"

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী রাগে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আমাকে আবার তাড়াইয়া আসিয়া বলিল, "হারামজাদী, যা মুখে আসে, তাই বল্‌বি? বেড়ি আমার হাতে থাকিবে না তো কি, পায়ে দেবে নাকি? আমি পাগল?"

তখন সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদী বল্‌বার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

তখন পাচিকা শশব্যস্তে বেড়ি ফেলিয়া দিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "ও মা, সে কি কথা গো! আমি কখন হারামজাদী বল্লেম? এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি নে। তোমরা আশ্চর্য করিলে মা।"

শুনিয়া সুভাষিণী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বামন-ঠাকুরানী তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—বলিলেন, "আমি যদি হারামজাদী ব'লে থাকি, তবে আমি যেন গোল্লায় যাই—"

আমি বলিলাম, "বালাই! ষাট!"

"আমি যেন যমের বাড়ী যাই—"

আমি। সে কি দিদি, এত সকাল সকাল! ছি দিদি, আর দু'দিন থাক না!

"আমার যেন নরকেও ঠাঁই হয় না—"

এবার আমি বলিলাম, "ওটি বলিও না, দিদি! নরকের লোকে যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি?"

বুড়ী কাঁদিয়া সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, "আমাকে যা মুখে আসিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? আমি চল্লেম গিন্নীর কাছে।"

সুভা। বাছা, তা হ'লে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি এঁকে হারামজাদী বলেছ।

বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, "আমি কখন হারামজাদী বল্লেম? (এক ঘা)—আমি কখন হারামজাদী বল্লেম? (দুই ঘা)—আমি কখন হারামজাদী বল্লেম?" (তিন ঘা)—ইতি সমাপ্ত।

তখন আমরা বুড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমি বলিলাম, "হাঁ গা বৌঠাকুরানী, হারামজাদী বল্‌তে তুমি কখন শুনিলে? উনি কখন এ কথা বল্লেন? কই, আমি তো শুনি নাই।"

বুড়ী তখন বলিল, "এই শুনিলে বৌদিদি! আমার মুখে কি এমন সব কথা বেরোয়?"

সুভাষিণী বলিল, "তা হবে—বাহিরে কে কাকে বলিতেছিল, সেই কথাটা আমার কানে গিয়া থাকিবে। বামন-ঠাকুরানী কি তেমন লোক? ওঁর রান্না কাল খেয়েছিলে তো? এ কলিকাতার ভিতর অমন কেউ রাঁধিতে পারে না।"

বামনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুন্‌লে গা?"

আমি বলিলাম, "তা তো সবাই বলে। আমি অমন রান্না খাই নাই।"

বুড়ী একগাল হাসিয়া বলিল, "তা তোমরা বল্‌বে বই কি মা!

তোমরা হ'লে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা তো রান্না চেন। আহা! অমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি—এ কোন বড় ঘরের মেয়ে। তা তুমি দিদি ভেবো না, আমি তোমাকে রান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

বুড়ীর সঙ্গে এইরূপ আপস হইয়া গেল। আমি অনেক দিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আজ হাসিলাম।

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। মাগী গিলিল অনেক। শেষে বলিল, "রাঁধ ভাল তো গা! কোথায় রান্না শিখিলে?"

আমি বলিলাম, "বাপের বাড়ী।"

গৃহিণী। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা?

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "এ তো বড়-মানুষের ঘরের রান্না। তোমার বাপ কি বড়মানুষ ছিলেন?"

আমি। তা ছিলেন।

গৃহিণী। তবে তুমি রাঁধিতে এসেছ কেন?

আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।

গৃহিণী। তা আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড়মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।

পরে সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ-মা, দেখো গো এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি তো বল্‌বেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।"

সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়া ছিল। ছেলে বলিল, "আমি কলা কথা বল্‌ব।"

আমি বলিলাম, "বল দেখি!"

সে বলিল, "কলা চাতু (চাটু) হাঁলি— আল্ কি মা?"

সুভাষিণী বলিল, "আর তোর শাশুড়ী।"

ছেলে বলিল, "কই ছাচুলী ?"

সুভাষিণীর মেয়ে আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ তোর শাশুড়ী।"

তখন ছেলে বলিতে লাগিল, "কুমুডিনী ছাচুলী, কুমুডিনী ছাচুলী।"

সুভাষিণী আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। ছেলে-মেয়ের মুখের এই কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল, "তবে আজ হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে।"

তার পর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমিও তার কাছেখাইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কয়টি বিয়ে, বেহান?"

কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, "কেন, রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগিল নাকি ?"

সুভা। ও ইয়াস্। বিবি পাণ্ডব ফার্ষ্ট কেলাশ বাবুর্চি ছিল।—এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে তো? ওঁর ছেলে পেট ভ'রে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোর্ট কর, তবে তোমার মাহিনা ডবল হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, "আমি মাহিনা চাই না। না লইলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ জন্য হাত পাতিয়া মাহিনা লইব। লইয়া তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গাল-গরীবকে দিও। আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

৫

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর একটি অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। তার শাসনে দাসদাসীরাও আমাকে অমান্য করিত না। এ দিকে রান্নাবান্না সম্বন্ধেও সুখ হইল। সে বুড়ী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরানী,—তাঁহার নাম সোনারমা,—তিনি বাড়ী গেলেন না।

মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব। তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিশে আমরা দুইজনেই রহিলাম। গিন্নী তার হাতে কলের পুতুল, কেন না, সে রমণের বৌ—রমণের বৌর কথা ঠেলে, কার সাধ্য? তাতে আবার সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখর, স্বভাবও তেমনি সুন্দর। এমন বন্ধু পাইয়া আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।

আমি মাছ-মাংস রাঁধি, বা দুই-একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকী সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে গল্প করি; হলো বা স্বয়ং গৃহিণীর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি। কিন্তু শেষ কাজটার একটা বড় গোলে পড়িয়া গেলাম। গৃহিণীর বিশ্বাস, তাঁর বয়স কাঁচা, কেবল অদৃষ্টদোষে গাছকতক চুল পাকিয়াছে। এই জন্যই তিনি লোক পাইলেই এবং অবসর পাইলেই পাকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে এই কাজে বেগার ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত, শীঘ্র শীঘ্রই ভাদ্রমাসের উলুক্ষেত সাফ করিতেছিলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সুভাষিণী আমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ডাকিল। আমি গৃহিণীর কাছ হইতে ছুটি লইয়া বধূর কাছে গেলাম। সুভাষিণী বলিল, "ও কি কাণ্ড! আমার শাশুড়ীকে নেড়া-মুড়া করিয়া দিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ এক দিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তা হ'লে কি টিক্‌তে পারবে? যাবে কোথায়?

আমি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। মরণ আর কি! দুই-একগাছি তুলে চ'লে আস্‌তে পার না?

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে যে, কই, পাকা চুল তো বেশী দেখিতে পাই না—এই ব'লে চ'লে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনে ডাকাতি কি করা যায় ? লোকে বল্‌বে কি ? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি ।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি ?

সুভাষিণীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম—হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, "সে গল্প আর একদিন করিব।"

সুভা। আমি যা বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ না ? আমার অনুরোধ।

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকা চুল তুলিতে বসিলাম। দুই-চারিগাছা তুলিয়া বলিলাম, "কই, আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই-একগাছা রহিল, কাল তুলে দিব।"

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, "আবার বেটীরা বলে, সব চুলই পাকা।"

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন দিন বসিয়া বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিব মনে মনে স্থির করিলাম। বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা টাকা সুভাষিণীর খাস-ঝি হারানীর হাতে দিলাম। বলিলাম, "একটা টাকায় এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।" হারানী হাসিয়া কুটপাট। হাসি থামিলে বলিল, "কলপ নিয়ে কি কর্‌বে গা ? কার চুলে দেবে ?"

আমি। বামন-ঠাকুরানীর।

এবার হারানী হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে বামন-ঠাকুরানী সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তখন সে হাসি থামাইবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বামন-ঠাকুরানী বলিলেন, "ও অত হাসিতেছে কেন ?"

আমি বলিলাম, "ওর অন্য কাজ তো দেখি না। এখন আমি বলিয়াছিলাম যে, বামন-ঠাকুরানীর চুলে কলপ দিলে হয় না? তাই অমন করছিল।"

বামন-ঠা। তা অত হাসি কিসের, দিলেই বা ক্ষতি কি? শনের নুড়ি, শনের নুড়ি ব'লে ছেলেগুলা খেপায়, তা সে দায়ে তো বাঁচিব।

সুভাষিণীর মেয়ে হেমা অমনই আরম্ভ করিল,—

"চলে বুড়ী, শনের নুড়ি,
খোঁপায় বাঁধা চুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ি,
কানে জোড়া দুল।"

হেমার ভাই বলিল, "জোলা দুম্।"

তখন কাহারও উপর জোড়া দুম্ পড়িবে আশঙ্কায় সুভাষিণী তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

বুঝিলাম, বামনীর কলপে বড় ইচ্ছা। বলিলাম, "আচ্ছা, আমি কলপ দিয়া দিব।"

বামনী বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও। তুমি বেঁচে থাক, তোমার সোনার গহনা হোক। তুমি খুব রাঁধতে শেখ।"

হারানী হাসে, কিন্তু কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কি ও?"

আমি বলিলাম, "একটা আরক। এটা চুলে মাথাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বটে, এমন আশ্চর্য আরক তো কখন শুনি নাই। ভাল, মাথাও দেখি। দেখিও, কলপ দিও না যেন।"

আমি উত্তম করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাথাইয়া দিলাম। দিয়া, "পাকা চুল আর নাই" বলিয়া চলিয়া গেলাম। নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার

সমস্ত চুলগুলি কালো হইয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হারানী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে তাহা দেখিতে পাইল। তখন সে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে "কি ঝি? কি ঝি?" এইরূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সে আবার ভিতর বাড়ীতে আসিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল। সেখানে সোনার মা চুল শুকাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" হারানী হাসির জ্বালায় কথা কহিতে পারিল না; কেবল হাত দিয়া মাথা দেখাইতে লাগিল। সোনার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, নীচে আসিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর মাথায় সব চুল কালো—সে ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ও মা! এ কি হলো গো! তোমার মাথার সব চুল কালো হয়ে গেছে গো! ও মা, কে না জানি তোমায় ওষুধ করিল!"

এমন সময়ে সুভাষিণী আসিয়া আমাকে পাকড়াইল—হাসিতে হাসিতে বলিল, "পোড়ারমুখী, ও করেছ কি? মার চুলে কলপ দিয়াছ?"

আমি। হুঁ।

সুভা। তোমার মুখে আগুন! কি কাণ্ডখানা হয় দেখ!

আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এমন সময়ে গৃহিণী স্বয়ং আমাকে তলব করিলেন, বলিলেন, "হাঁ গা কুমো, তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ?" দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, "অমন কথা কে বল্লে মা?"

গৃ। এই যে সোনার মা বল্‌ছে।

আমি। সোনার মার কি? ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা! আরশি একখানা আন দেখি।

একখানা আরশি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও মা! সব চুল কালো হয়ে গেছে! আঃ আবাগের বেটী! লোকে এখনই বল্‌বে, কলপ দিয়েছে।"

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সে দিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন, আর বলিলেন, "বাছা, কেবল কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়া বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত একজোড়া সোনার বালা আমায় বকশিস করিলেন। লইতে, আমার মাথা কাটা গেল—চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না।

একটু অবসর পাইয়া বুড়া বামন-ঠাকুরানী আমাকে ধরিলেন। বলিলেন, "ভাই, সে ওষুধটা আর আছে, যাতে চুল কালো হয়?"

আমি। আছে বই কি।

আমি তখন কলপের শিশি বামন-ঠাকুরানীকে দিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরানী রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে, অন্ধকারে, তাহা চুলে মাখাইতেছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই; কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকালবেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলা পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত, কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো; আর মুখখানির কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনিবিড়ালের মত। দেখিবামাত্র সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে।

সুভাষিণীর মেয়েও বুড়ীকে জ্বালাইল, বলিল, "বুড়ীপিসী, সাজ সাজালে কে?"

একদিন একটা বিড়ালে হাঁড়ি হইতে মাছ খাইয়াছিল, তাহার মুখে কালি-ঝুলি লাগিয়াছিল। সুভাষিণীর ছেলে তাহা দেখিয়াছিল। সে বুড়ীকে দেখিয়া বলিল, "মা, বুলী পিচী হালি খেয়েছে।"

অথচ বামন-ঠাকুরানীর কাছে, আমার ইঙ্গিতমত, কথাটা কেহ ভাঙ্গিল না। তিনি সেই অবস্থায় রমণবাবুকে অন্ন দিতে গেলেন। রমণবাবু দেখিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তাঁহার খাওয়া হইল না।

শুনিলাম, রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে কর্তামহাশয় তাহাকে 'দূর! দূর!' করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শেষে দয়া করিয়া সুভাষিণী বুড়ীকে বলিয়া দিল, "আমার ঘরে বড় আয়না আছে। মুখ দেখ গিয়া।"

বুড়ী গিয়া মুখ দেখিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং আমাকে গালি পাড়িতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, "আমি চুলে মাখাইতে বলিয়াছিলাম, মুখে মাখাইতে বলি নাই।" বুড়ী তাহা বুঝিল না। আমার মুণ্ড ভোজনের জন্য যম পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। শুনিয়া সুভাষিণীর মেয়ে শ্লোক পড়িল—

"যে ডাকে যমে, তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই, বুড়ী ম'রে যা না ভাই॥"

শেষে আমার সেই তিন বছরের জামাতা, একখানা রাঁধিবার চেলা-কাঠ লইয়া গিয়া বুড়ীর পিঠে বসাইয়া দিল। বলিল, "আমাল্ ছাছুলী।" তখন বুড়ী আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে যত কাঁদে, আমার জামাই তত হাততালি দিয়া নাচে, আর বলে, "আমাল্ ছাছুলী, আমাল্ ছাছুলী।" আমি গিয়া তাকে কোলে নিয়া, তার মুখচুম্বন করিলে তবে থামিল।

৬

সেই দিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নিভৃতে বসাইল। বলিল, "বেহান, তুমি সেই কালাদীঘির ডাকাতির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজিও বল নাই। আজ বল না, শুনি।"

আমি বলিলাম, "সে আমারই হতভাগ্যের কথা। আমার বাপ বড়মানুষ, এ কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড়মানুষ—কিন্তু তাঁহার তুলনায় কিছুই নহেন। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাতিই তাহার কারণ।"

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না। শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না, আর সমস্ত বলিলাম। শুনিতে শুনিতে সুভাষিণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও যে বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

সে দিন এই পর্যন্ত। পরদিন সুভাষিণী আমাকে আবার নিভৃতে লইয়া গেল। বলিল, "বাপের নাম বলিতে হইবে।"

তাহা বলিলাম।

"তাঁর বাড়ী যে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে।"

তাও বলিলাম।

সুভা। ডাকঘরের নাম বল।

আমি। ডাকঘর! ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সুভা। দুর পোড়ারমুখী! যে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম।

আমি। তা তো জানি না। ডাকঘরই জানি।

সুভা। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না অন্য গ্রামে?

আমি। তা তো জানি না।

সুভাষিণী বিষণ্ণ হইল। আর কিছু বলিল না। পরদিন সেইরূপ নিভৃতে বলিল, "তুমি বড় ঘরের মেয়ে, কত কাল আর রাঁধিয়া খাইবে? তাই আমি আর র-বাবু পরামর্শ করিয়াছি, তোমার বাপকে পত্র লিখিব যে, তুমি এইখানে আছ।"

র-বাবু কিনা রমণবাবু। এইরূপে সুভাষিণী আমার কাছে স্বামীর নাম ধরিত।

আমি। তার পর?

সুভা। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম। দিন গনিতে লাগিলাম, কত দিনে পত্রের উত্তর আসিবে? কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। আমার কপাল পোড়া—মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণবাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু না-ছোড়। সুভাষিণী আসিয়া আমাকে বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি তখন লিখিতে শিখিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা হইল, "শ্বশুরের নাম?"

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম?"

বলিলাম, "তা কি জানি?"

শুনিলাম, রমণবাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ণ হইলাম। বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

৭

এক দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, কিছু ঘটার আয়োজন। রমণবাবু উকিল। তাঁহার একজন বড় মক্কেল ছিল। দুই দিন ধরিয়া শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই পাকশাকের কিছু বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরামবাবু, রমণবাবু ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর উপর—আমি বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না।

বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণবাবু বুড়ীকে ধমকাইতেছিলেন। সেই সময়ে একজন রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ক'রে লোককে অপ্রতিভ করা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'য়েছে?"

ঝি বলিল, "বুড়ী দাদাবাবুর বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উহুঁ উহুঁ ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন—সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"

আমি এ দিকে শুনিতেছিলাম, রমণবাবু বামনীকে ধমকাইতেছেন— "পরিবেশন করতে জান না তো এসো কেন? আর কাকেও পাল দিতে পার নি?"

রামরামবাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম নয়। কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়ে।"

কাজেই, আমি হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া, পরিষ্কৃত হইয়া কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, পরিবেশন করিতে গেলাম। কে জানে যে, এমন কাণ্ড বাধিবে? আমি জানি যে, আমি বড় বুদ্ধিমতী —জানিতাম না যে, সুভাষিণী আমায় এক হাটে বেচিতে পারে, আর এক হাটে কিনিতে পারে।

আমি ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়। তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ। আমি একটু অন্যমনস্ক হইলাম। মাংসের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে

পাইলাম। আমি সমুদয় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইঁহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আবার অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমন সময়ে রামরামবাবু আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। ইনি রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরামবাবু, আপনার পরিচারিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরামবাবু বলিলেন, "হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই-একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

রামরাম বলিলেন, "তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার জো পাইলেন, একেবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

আমি স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্যকথা বলা আমার হাতেই রহিল। এই ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্তব্য, আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।—দেখিলাম যে, তিনি আর

ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন, "উপেন্দ্রবাবু, আহার করুন না!" এটি শুনিবার আমার বাকী ছিল। উপেন্দ্রবাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

মাংসপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছেন, তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।

পরে সুভাষিণীর নিকট পরামর্শ করিয়া তাহার ও রমণবাবুর কৌশলে এবং হারানীর সহায়তায় রাত্রে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কথা আসিল না বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন?"

মনে করিলাম, পরিচয় দিই—কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন—যদি মনে করেন যে, ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রী-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্যলোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে,—তাহা হইলে কি প্রকারে ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরে সেই রাত্রেই স্বামীর সহিত তাঁহার নিজের বাসায় আসিলাম।

৮

আমরা কলিকাতায় দিনকতক সুখে-স্বচ্ছন্দে রহিলাম। তার পর দেখিলাম, স্বামী একদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বিমর্ষ কেন?"

তিনি বলিলেন, "বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে, বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি?" আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম—মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

আমি। না গেলেই নয়?

তিনি। না গেলেই নয়।

আমি। কতদিনে ফিরিবে? শীঘ্র ফের যদি, তবে আমাকে না হয় এখানেই রাখিয়া যাও।

তিনি। শীঘ্র ফিরিতে পারিব, এমন ভরসা নাই। কলিকাতায় আমরা কালেভদ্রে আসি।

আমি বিস্তর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "তুমি যাও—আমার কপালে যা থাকে, তাই ঘটিবে। আমাকে তুমি এ সময় বিদায়—"

তিনি আমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন, "আর এ কথায় কাজ নাই। আজ ভাবি। যা ভাবিয়া স্থির করিব, কাল বলিব।"

বৈকালে তিনি রমণবাবুকে আসিতে লিখিলেন।

রমণবাবু আসিলেন। আমি কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন, "আপনাদিগের সেই পাচিকাটি—যে অল্পবয়সী—তাহার নাম কি?"

রমণ। কুমুদিনী।

উপেন্দ্র। তাহার বাড়ী কোথায়?

র। এখন বলিতে পারি না।

উ। সধবা না বিধবা?

র। সধবা।

উ। তার স্বামী কে, জানেন ?

র। জানি।

উ। কে ?

র। এক্ষণে বলিবার অধিকার নাই।

উ। কেন, কিছু গুপ্ত রহস্য আছে নাকি ?

র। আছে।

উ। আপনারা উহাকে কোথায় পাইলেন ?

র। আমার স্ত্রী তাঁহার মাসীর কাছে উহাকে পাইয়াছেন।

উ। যাক্—এ সব বাজে কথা। চরিত্র কেমন ?

র। অনিন্দনীয়। আমাদের বুড়ী রাঁধুনীটাকে বড় ক্ষেপাইত। তা ছাড়া একটি দোষও নাই।

উ। উহার বাড়ী কোথায়, কেন বলিতেছেন না ?

র। বলিবার অধিকার নাই।

উ। স্বামীর বাড়ী কোথায় ?

র। ঐ উত্তর।

উ। স্বামীকে চিনেন ?

র। চিনি।

উ। ঐ স্ত্রীলোকটি এখন কোথায় ?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই।

উ। আচ্ছা, আপনি তো সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে কি না ?

র। পারে। আপনি কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উ। আর একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন ?

র। পারি—এক সর্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন। রাজী ?

স্বামী অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "রাজী। আমার অভিপ্রায়ের পোষক হইবে তো ?"

র। হইবে।

অন্যান্য কথার পর রমণবাবু উঠিয়া গেলেন।...

সে দিন দিবা-রাত্রি আমার স্বামী অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে বড় কথাবার্তা কহিলেন না।

পরদিন প্রাতে তিনি আমাকে বলিলেন, "একটা ভারী জুয়াচুরি করিব। তাই কাল সমস্ত দিন ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই।"

আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা—রামরাম দত্তের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইয়াছি ?

তিনি। আ সর্বনাশ! তুমি কে ? ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে ? আর আমার গুপ্ত অভিপ্রায় বা জানিলে কি প্রকারে ? তুমি মানুষী, না মায়াবিনী ?

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "আমি মানুষী নহি, আমি কি তাহা পরে বলিব।"

স্বামী স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ঠাকুর-দেবতা খুব মানিতেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। অতএব আমি যে বলিলাম, আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল।

তিনি কিছুকাল স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পর নিজ-বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দূর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ?"

আমি। জিজ্ঞাসা কর।

তিনি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, জান! তার বাপের নাম কি ?

আমি। হরমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁর বাড়ী কোথায় ?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। বাড়ীর সদর দরজা কোন্ মুখ ?

আমি। দক্ষিণমুখ। একটা বড় ফটকের দুই পাশে দুইটা সিংহী।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে ?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি ?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী ?

আমি। তোমার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি ?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে ?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি। তাতে খুব পদ্ম ফোটে।

তিনি। হাঁ, তা দেখিয়াছিলাম। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে ? তার বিচিত্র কি ? তাই এত জান। আর গোটাকতক কথা বল দেখি ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয় ?

আমি। পূজার দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে ?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত।

তিনি। স্ত্রী-আচার কালে একজন আমার বড় জোরে কান মলিয়া দিয়াছিল। তার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাম?

আমি। বিন্দুঠাকুরানী—বড় বড় চোখ, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট, নাকে ফাঁদি নথ।

তিনি। ঠিক। বোধ হয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। তাদের কুটুম্ব নও তো?

আমি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরানী, কি রাঁধুনীর মেয়ের জানা সম্ভব নয়, এমন দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না?

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল?

আমি।—সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "বাসরঘরে সকলে উঠিয়া গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কি কথা সে, বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'বল দেখি, আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল?' ইন্দিরা বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম।'"

স্বামী ধীরে ধীরে বালিশের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিলেন। আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।"

দেখিলাম, এক্ষণে অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে পারি। আমার স্বামীর নিজমুখ হইতে আমার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে, আমি পরিচয় দিব না স্থির করিয়াছিলাম; তাই বলিলাম, "এখন আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার

নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই জন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া এই মানবরূপ ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহাভৈরবী দর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে তোমার শ্বশুর বাড়ীর উত্তরে। সে তাঁহাদেরই ঠাকুরবাড়ী। চল, মহেশপুরে যাই।"

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে। কুমুদিনী যদি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ! পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত সুখী কে?"

তিনি। তবে চল, কাল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া মহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে আপাততঃ বাড়ী যাইব। জোড় হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি যে, তুমি ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আর বিদ্যাধরীই হও, আমাকে ত্যাগ করিও না।

আমি। না; আমার শাপান্ত হইলেও দেবীর কৃপায় আবার তোমাকে পাইতে পারিব।

"এ কথাটা তো ডাকিনীর মত নহে।" এই বলিয়া তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। আর কেহ নহে, রমণবাবু। রমণবাবু আমার স্বামীর সঙ্গে আসিয়া আমাকে পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষে বলিলেন, "সুভাষিণীকে কি বলিব?"

আমি বলিলাম, "বলিবেন, আমি কাল মহেশপুরে যাইব। গেলেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব।"

স্বামী বলিলেন, "আপনার এ সব জানা আছে নাকি?"

শ্বশুর রমণবাবু বলিলেন, "আমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী সুভাষিণী সব জানেন।"

বাহিরে আসিয়া স্বামী রমণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন?"

রমণবাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।"

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণবাবু আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

৯

আমরা যথাকালে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগের অবস্থিতি করিতে বলিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতামাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পর বলিব।"

সময়ান্তরে স্থূলকথা তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু সব কথা নহে। এতটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম, স্বামীর নিকট হইতেই আসিয়াছি এবং তিনিও দুই-একদিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। কামিনী আমার

অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট, বড় রঙ্গ ভালবাসে। সে বলিল, "দিদি, যখন মিত্রজা এত বড় গোবর-গণেশ, তাঁকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম। বাপ-মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই, সেটা এইখানেই হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আমি যে এখানে আসিয়াছি, এ কথাটা তাঁহারা জামাতা আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন।

পরদিন জামাতা আসিলেন। পিতামাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অপেক্ষা করিলেন। আমি আসিয়াছি, এ কথা বাহিরে কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, তখন বড় বিষণ্ণবদন।

জলযোগের সময় আমি সম্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর দুই-চারিজন জ্ঞাতি ভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তিনি যেন কলে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায়?"

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায়? কালাদীঘিতে সেই যে সর্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর তো আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তাঁর মুখখানা বড় লম্বা হইয়া গেল, কথা আর কহিতে পারেন না। চক্ষের জল সামলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না, একটা

স্ত্রীলোক পরশুদিন পালকি করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনি একটা আশ্চর্য ব্যাপার উপস্থিত হইল, হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"

তিনি জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "যে স্থান হইতে কুমুদিনী অন্তর্ধান করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না?"

কামিনী বলিল, "পাও বই কি? অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তার পর আলো নিয়ে উপেন্দ্রবাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিলাম।

সেইখানে আলো ধরিয়া কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, "কুমুদিনী, কুমুদিনী, যদি আসিয়াছ তো আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি বার দুই-চারি এই কথা বলার পর কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি, উঠে আয়। ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি?"

এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। আমরা খুব ছুটিয়া আসিলাম। তিনি একটু

প্রকৃতিস্থ হইলেই আমাদের পিছু পিছু ছুটিলেন, কিন্তু অন্ধকার—পথ অচেনা, একটা চৌকাঠ বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় খাইলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম, দুই জনে দুই দিক্ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কামিনী চুপি চুপি বলিল, "আমরা বিদ্যাধরী, তোমার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি।"

এই বলিয়া তাঁকে টানিয়া আনিয়া আমার শয্যাগৃহে উপস্থিত করিলাম। সেখানে আলো ছিল। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এ কি! এ তো কামিনী, আর এ তো কুমুদিনী।" কামিনী রাগে দশ-খানা হইয়া বলিল, "আঃ পোড়াকপাল! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করেছ? কোদাল পাড় নাকি? এ কুমুদিনী না—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে! তোমার পরিবার। আপনার পরিবার চিন্‌তে পার না?"

তখন স্বামী আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন।

সে দিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসব বাধিল। সেই রাত্রে কামিনীতে আর উ বাবুতে প্রায় একশত বার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। সকল বারই তিনি হারিলেন।

১০

কালাদীঘির ডাকাতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণবাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন।

আমার পিতামাতার অনুরোধে উ-বাবু আর একদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সেদিনও বড় আনন্দে গেল।

আমি পরদিন শিবিকারোহণে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলিলাম। সেখানে এবার নির্বিঘ্নে পৌছিলাম। স্বামী মাতাপিতা সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষ নিবেদন করিলেন। রমণবাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর শাশুড়ী

সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণবাবুর নিকট হারানীর জন্য পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। উত্তর আনন্দপরিপূর্ণ।

সে লিখিয়াছিল—"হারানী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। অনেক বুঝান-পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানারকম ব্রতনিয়ম করিবার ফর্দ করিয়াছে। যতদিন না তোমার এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সে আর হাসে নাই, কিন্তু এখন তার হাসির জালায় বাড়ীর লোক অস্থির হইয়াছে।······পাচিকা-ঠাকুরানী, যে অবধি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে চলিয়া গিয়াছ, সে অবধি বড় আস্ফালন করিত; বলিত, 'আমি বরাবর জানি, সে ভাল মানুষ নয়। তার রকম-সকম ভাল নয়। কতবার বলেছি, যে, এমন মানুষ তোমরা রেখ না। তা কাঙ্গালের কথা কে গ্রাহ্য করে? সবাই কুমুদিনী কুমুদিনী ক'রে অজ্ঞান।' তার পর যখন শুনিল যে, আপনার স্বামীর সঙ্গে গিয়াছ, তুমি বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বৌ—এখন আপনার ঘর বর পাইয়াছ, তখন বলিল, 'আমি তো বরাবর বল্‌ছি মা, যে, সে বড়ঘরের মেয়ে, ছোটঘরে কি আর অমন স্বভাব-চরিত্র হয়? যেমন রূপ, তেমনই যেন লক্ষ্মী! সে ভাল থাকুক মা! ভাল থাকুক। তা, হাঁ দেখ বৌদিদি, আমাকে কিছু পাঠিয়ে দিতে ব'লো।'"

গৃহিণী সম্বন্ধে সুভাষিণী লিখিয়াছিল—"তিনি তোমার এই সকল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও র-বাবুকে কিছু ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'সে যে এত বড় ঘরের মেয়ে, তা তোরা আমাকে আগে বলিস্ নি কেন? আমি তাকে খুব যত্নে

রাখিতাম।' আর তোমার স্বামীরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন, 'হোক্ তাঁর পরিবার, অমন রাঁধুনীটা নিয়ে য ওয়া তাঁর কিছু ভাল হয় নাই।' "

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণঠাকুরানীটি ও অন্যান্য ভৃত্যদিগের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলাম।

তার পর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময়ে বিশেষ অনুরোধে স্বামী আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষিণীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলাম—গৃহিণীকে উপযুক্ত উপহার দিলাম—যে যাহার যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ দান ও সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার স্বামীর প্রতি অপ্রসন্ন। তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না, কথাটা আমাকে অনেকবার শুনাইলেন। আমিও রমণবাবুকে কিছু রাঁধিয়া খাওয়াইলাম।

* * * *

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।

———

মৃণালিনী

১

গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে প্রয়াগতীর্থ। বর্ষাকাল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিয়াছেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গাযমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধবেশ। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতিদীর্ঘাকার পুরুষ, শরীর শুষ্ক, আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত, ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য সিদ্ধ হয় নাই। যবন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল; এই জন্য আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ শুনিয়াছি। বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে হাতিতে মারিত, ভালই হইত—তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে?"

হেমচন্দ্র। পিতৃশত্রুকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া।—আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধরাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ সকল ঘটনা তো অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম, তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দয়া। আমার আংটি আপনি চাহিয়া লইয়াছিলেন। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম।—মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "যদি তাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; আবার কি সেই মৃণালিনীপাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? হেমচন্দ্র, ধৈর্যাবলম্বন কর —মৃণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায়, না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।"

মা। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না।

হে। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি, জানিয়া আসিয়াছ?

হে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "এত দিনে বিধাতা বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হে। কি প্রকার?

মা। গনিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে। যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবে।

হে। তবে আমার জয়লাভের সম্ভাবনা কোথা? আমি তো বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক্। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হে। আমি তখন বণিক্ বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম।"

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানে গিয়া বিহিত উদ্‌যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন।

২

লক্ষ্মণাবতীনিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত কথোপকথনের কোন বিঘ্ন জন্মিতেছিল না।

এক যুবতী অপরাকে কহিলেন, "সই মৃণালিনী, কেন তুমি মাধবাচার্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে?" মৃণালিনী বলিলেন, "সই মণিমালিনী, মাধবাচার্যের কথায় আসি নাই। তাঁহাকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্বকও এখানে আসি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর আমার দাসী আমাকে এই আঙ্গটি দিল এবং বলিল যে, যিনি এই আঙ্গটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙ্গটি। তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষ থাকিলে, তিনি এই আঙ্গটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদের বাটীর পিছনেই বাগান ছিল। যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।—আমি বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল।—সে ব্যক্তি বলিল, 'মা, আমার নাম মাধবাচার্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। তোমাকে আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।' এই কথাতেই হউক, আর

অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি। ও কি ও সই?"

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—

"মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী,
শ্যামবিলাসিনী—রে!"

মৃণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে?" মণিমালিনী কহিলেন, "বাহির-বাড়ীতে গায়িতেছে।" গায়ক গায়িতে লাগিল—

"কহ লো নাগরী, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী—রে।"

মৃ। সই, কে গায়িতেছে জান?

মণি। কোন ভিখারিনী হইবে।

আবার গীত।—

"বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী—রে;
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি—রে।"

মৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, "সই, সই, উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।" মণিমালিনী তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, "তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।"

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। সে খর্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী—শরীরের গঠন সুন্দর। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার। সে আজ্ঞামত পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল।

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি সুন্দর গাও।—সই মণিমালিনী, একে কিছু দাও না?"

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন ভিখারিনী, তোমার নাম কি?"

ভিখা। আমার নাম গিরিজায়া।

মৃণা। তোমার বাড়ী কোথায়?

গি। এই নগরেই থাকি।

মৃ। এ গীতটি কোথায় শিখিলে?

গি। একটি বেনে আমাকে শিখাইয়াছেন।

মৃ। সে বেনে কোথায় থাকে?

গি। এই নগরেই আছে।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মৃণালিনী সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, "তুমি যে সন্ধানে আসিয়াছ, আমি তাহা বলিয়া দিতে পারি, মনে রাখিতে পারিবে?"

গিরি। পারিব—বল।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে একটি কবিতা বলিলেন। তার পর মণিমালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া গিরিজায়াকে কানে কানে কহিলেন, "তোমার বেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও। তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।"

গিরিজায়া কহিল, "বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।"

মণিমালিনী কিছু চাউল, এক ছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন।

৩

লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। অপরাহ্নে বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোক-

বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া হেমচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ পথপ্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন, "দিগ্বিজয়, ভিখারিনী আজ এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, "কে ও, দিব্বিজয় ?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয়।"

গি। ভাল দিগ্বিজয়—আজ কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ ?

দি। তোমার দিক্।

গি। আমি কি একটা দিক্ ? তোর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই।

দি। কেমন করিয়া থাকিবে—তুমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন ?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন, তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না ?

দি। না, সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্যই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিল। দিগ্বিজয় অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন করিল।

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "কে, গিরিজায়া ? আশা কি মিটিল ?"

গি। দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে,
মৃণাল-উপরে মৃণালিনী :

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও—কোথায় মৃণালিনী ?

গি। এই নগরে !—সন্ধান করিয়াছি ।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, "মহাশয়, আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোক-তলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হাতে দিয়া কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এখন অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। বলিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যায় ভুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য।

মাধবাচার্য কহিলেন, "বৎস, গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি এ পর্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এ জন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। তোমাকে আজ আমার সঙ্গে নবদ্বীপে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হানি নাই—আমি আশা-ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি। চলুন।"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইলেন।

৪

মৃণালিনী ও গিরিজায়া প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সম্মিলিত হইলেন। গিরিজায়া মৃণালিনীর হস্তে হেমচন্দ্রের পত্র দিল। মৃণালিনী পত্র লইয়া নিম্নলিখিতমত মনে মনে পাঠ করিলেন।—

"মৃণালিনী, কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি। তৎসাধন জন্য গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। এক বৎসর কোনক্রমে দিনযাপন কর। পরে ঈশ্বর যদি প্রসন্ন হন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুত্রবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব। এই বালিকা-হস্তে উত্তর প্রেরণ করিও।"

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, আমার পাতা, লেখনী কিছুই নাই যে, উত্তর লিখিব। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও।"

গিরিজায়া কহিল, "উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব ? আমি আসিবার সময় তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই—শুনিলাম, সন্ধ্যাকালে তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ লইয়া গিয়াছেন।"

মৃ। মাধবাচার্য ! মাধবাচার্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি

বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"—গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, "তবে সাধ্বী, এইবার জালে পড়িয়াছ।"

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিত হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়।"

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র—ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র।

মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ তাঁহাকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল।

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, "রাক্ষসী, তোর দন্তে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে, পৃষ্ঠ দিয়া দরদর রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন; কেন না, তিনি তো ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্বাকৃতি বালিকামূর্তি সম্মুখ হইতে অপসৃতা হইতেছে, দেখিতে পাইলেন।

গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

মৃণালিনী পলায়ন করিলেন না। তিনি গজেন্দ্রগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ। হৃষীকেশ পুত্রকে

শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? কেন ষাঁড়ের মত চিৎকার করিতেছ?"

ব্যোমকেশ কহিল, "মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে।"

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। নিঃশব্দে মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন, "মৃণালিনী, তোমার এ কি চরিত্র?—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন?"

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে, সে মিথ্যাবাদী।

হৃষীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, "কি পাপীয়সী, আমার অন্নে উদর পুরাবি, আর আমাকে দুর্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ।"

মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল, কহিলেন, "তাহাই হইবে।"

এই বলিয়া মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চলিলেন।

এ দিকে মণিমালিনী ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভৎর্সনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন প্রাঙ্গণে মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন।

মৃণালিনী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে?

গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বই তো গোরু নয়।

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম ?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম।—এখন তুমি কোথা যাইবে ?

মৃ। তোমার ঘরদ্বার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। চল, তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়া বলিল, "কিন্তু সে তো কুঁড়ে। সেখানে কয়দিন থাকিবে ?"

মৃ। কালি প্রাতে অন্যত্র যাইব।

গি। কোথা ?

মৃ। নবদ্বীপে যাইব স্থির করিয়াছি।

গি। একা যাইবে ?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব ?

গি। আমি যাব। আমার সর্বত্র সমান।

৫

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। একদিকে পৃথগাসনে অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্যদিকে মহামাত্য ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। সর্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্যসকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতি-বিশারদ, আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" সকল কথা বর্ষীয়ান্ রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, মাধবাচার্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনের কি উপায় হইয়াছে? বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।"

মাধবাচার্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্যাবর্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?—আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে, আসুক।"

রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না, মাধবাচার্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচার্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে, অবশ্য ঘটিবে—তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?"

মাধ। ভাল, সভাপণ্ডিত মহাশয়, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন ?

দামো। বিষ্ণুপুরাণে আছে ; যথা—

মাধ। 'যথা' থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন ; দেখান, এরূপ উক্তি কোথায় আছে ?

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম ? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কিনা ?

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানব ধর্মশাস্ত্রেও কি পারদর্শী নহেন ?

দামো। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন্ ছার ?

মাধ। তুরকজাতীয় কর্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধ। সাধু! সাধু!—যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে ?

পশু। কিছুদিন এই নগরী পর্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

মাধ। কতক কতক জানিয়াছি।

পশু। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মাধ। প্রস্তাবের তাৎপর্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

পশু। বিশেষ শুনিয়াছি। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মাধ। আসিয়াছেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া উভয়ের শত্রু-বিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়েরই মঙ্গল।

পশু। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার

নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

৬

উপনগরপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থে রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র তথায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দন নামে এক বৃদ্ধ, অসমর্থ ও নিঃসহায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছুদিন হইল ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া, তাঁহারা বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য ভৃত্যদ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কানে তুলেন না।"

তখন হেমচন্দ্র স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। জনার্দন আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হে। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল ; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনুমান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক, কার্যসাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "শুনিলাম, আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই ; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চ-স্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না ? তোমার বাটীতে কি ? আদ্যশ্রাদ্ধ ?

হে। ভাল, আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল ; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা তো আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা ?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল-সীমারূপিণী এক বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ?"

হে। তাহা তো পাইলেন না, দেখিলাম। তুমি কে ?

বালিকা। আমি মনোরমা। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে। শুনিলাম, ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

মনো। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

মনো। কেন?

হে। মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?

মনো। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজ হইতে ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া তিরস্কার করিবে না তো!

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা?—না উন্মাদিনী?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না।

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না—তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্বাদ

করুন।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং “ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী!” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ, কানে কম শোনেন।”

৭

হেমচন্দ্র কিছুদিন উপবন-গৃহে বাস করিলেন। জনার্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতা-প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত; মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুতঃ মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সহজে মনোরমাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন তাহাকে অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী দেখিতেন।

মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্যটনে যাত্রা করিলেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা প্রদোষকালে শয়নকক্ষে, পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া হেমচন্দ্র মুক্তবাতায়নপথে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত নক্ষত্রখচিত। বাতায়নপথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল। অকস্মাৎ হেমচন্দ্র বাতায়ন-সন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। মুখখানি অতি বিশাল শ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন। অসি গ্রহণ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায় কেহ নাই। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে,

গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকেও দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যোদ্ধবেশে আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে। তিনি একাকী সেই গভীর নিশাতে তুরকের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্বচর। যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবন-গৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া রাজপথে যাইতে হয়, সে লোকবিরল গ্রাম্যপথমাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরম্য সোপানাবলী-শোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শ্বে বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সংবদ্ধ হইয়া ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। কিংবদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

হেমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্বাধঃস্থ সোপানে জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত রাত্রে কে এ স্থানে? সে তো তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে

অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সরিল না, পূর্বমত রহিল। হেমচন্দ্র তাহার নিকটে আসিলেন। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল; হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন, "কে, মনোরমা! তুমি এখানে!"

মনোরমা কহিলেন, "আমি এখানে অনেক বার আসি—কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

হেম। আমার কর্ম আছে।

মনো। এ রাত্রে কি কর্ম?

হেম। পশ্চাৎ বলিব। তুমি এ রাত্রে এখানে কেন?

মনো। স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম।

হেম। রাত্রে স্নান কেন?

মনো। আমার গা জ্বালা করে।

হেম। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন?

মনো। এখানকার জল বড় শীতল।

হেম। তুমি সর্বদা এখানে আইস?

মনো। আসি।

হেম। এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ?

মনো। তুরকের বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে?"

মনো। আমি পূর্বে তুরক দেখিয়াছি।

হেম। সে কি? কোথায় দেখিলে?

মনো। যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরকের অনুসরণ করিবে?

হেম। করিব—সে কোন্ পথে গেল?

মনো। কেন?

হেম। তাহাকে বধ করিব। তুরক আমার পরম শত্রু।

মনো। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে?

হেম। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।

মনো। পারিবে?

হেম। পারিব।

মনোরমা বলিল, "তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।"

৮

গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ এ কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

আজি রাত্রে পশুপতি তাঁহার উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতে আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দেখাইলেন।

পশুপতি কহিলেন, "বুঝিলাম, আপনি তুরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র, সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

মহ। খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা-যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন?

পশু। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা ন না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব?

মহ। আপনি কি চাহেন?

পশু। খিলিজি কি দিবেন?

মহ। গৌড়ে আপনি বখতিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন।

পশু। আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।

মহ। কিন্তু আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি?

পশু। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না।

পাঁচ জন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুর প্রবেশ করিতে বলিও, কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না "কে তোমরা ?"

মহ। আরও এক কথা বাকী আছে। এই দেশে যবনের শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই তাহার মুণ্ড যবন-শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

পশু। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

মহ। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন।...

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য একজন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব ?"

পশুপতি কহিলেন, "কর।"

সে প্রবেশ করিয়া প্রণত হইলে, পশুপতি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল, মঙ্গল সংবাদ তো ?—যবনসৈন্য কত দেখিলে ?"

শান্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে। —কিন্তু মহম্মদ আলি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে ?"

শান্ত। আমি আসিবার সময় দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।— তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

পশু। কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবে। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য সাধন করিতে হইবে। যবন-সেনাপতির

ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্ন-মস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।

শান্ত। কার্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপড়ে-মাছি নন।

পশু। কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শান্ত। লোকে কি বলিবে ?

পশু। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শান্ত। যে আজ্ঞা, চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র সূক্ষ্মকারুকার্যখচিত মন্দিরে অষ্টভূজামূর্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "জননী! বিশ্বপালিনী! আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। জগৎপ্রসবিনী! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

এই বলিয়া পশুপতি গাত্রোত্থান করিলেন—শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া জীবনময়ী প্রতিমা-রূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বীণানিন্দিত-স্বরে কহিলেন, "পশুপতি!"

পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা!

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত গাম্ভীর্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ?"

মনো। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

পশু। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

মনো। পশুপতি, আবার? রাজকার্যে না নিজকার্যে?—আমি সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—না হয়, তুমি আগে শুনিয়াছ।"

মনো। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

পশু। কেন, মনোরমা?

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি,তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব?—কি প্রকারে ভালবাসিব?"

পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিলেন, "শুন পশুপতি; তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনি মনোরমা আবার ফিরিলেন; আসিয়া পশুপতির হস্তধারণ করিলেন। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ববিশিষ্টা মূর্তি আর নাই—সুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?"

পশু। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

মনো। আর আমি এমন করিব না।

পশু। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

মনো। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৯

বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্তী হইয়া যবনসন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "সম্মুখে ঐ অট্টালিকা দেখিতেছ? ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।"

হেম। তুমি কোথায় যাইবে?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহপ্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় যোদ্ধবেশে হেমচন্দ্রকে দেখিয়া কহিল, "আপনি কে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না, কেন?"

শান্ত। আপনি এখানে কি করিতেছেন?

হেম। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, "যবন কোথায়?"

হেম। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির ন্যায় স্বরে কহিল, "এ গৃহে কেন?"

হেম। তাহা আমি জানি না।

শান্ত। এ গৃহ কাহার?

হেম। তাহা জানি না।

শান্ত। আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, যবন প্রবেশ করিয়াছে?

হেম। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে?

শান্ত। এই গৃহ আমার। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন— উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিল এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনি এই গৃহমধ্যে অবস্থিতি করুন; আমি সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে।"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহিরদিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন।

১০

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিলেন। হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও।"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন?"

মনো। তাহা পরে বলিব।

হেম। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে?

মনো। শান্তশীল।

হেম। শান্তশীল কে?

মনো। চৌরোদ্ধরণিক।

হেম। এই কি তাহার বাড়ী ?

মনো। না।

হেম। এ কাহার বাড়ী ?

মনো। পরে বলিব।

হেম। যবন কোথায় গেল ?

মনো। শিবিরে গিয়াছে।

হেম। শিবির! কত যবন আসিয়াছে ?

মনো। পঁচিশ হাজার।

হেম। কোথায় তাদের শিবির ?

মনো। মহাবনে। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনোরমা কহিলেন "ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?"

হেম। পঁচিশ হাজারের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে ?

মনো। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে ?

হেম। এখন ঘরে যাব না।

মনো। কোথা যাবে ?

হেম। মহাবনে।

মনো। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হেম। যবনদিগকে দেখিতে।

মনো। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে ?

হেম। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব।

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্বনাশ! ছি ছি!"

হেম। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে ?

মনো। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।...

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন; তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শর সন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষা-কৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্বার শর-সংযোগ করিল এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল।—এইরূপ অবিরত হস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদি-মণ্ডিত চর্ম হস্তে লইলেন এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজালবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ দুই-এক শর অশ্ব-শরীরে বদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শর ত্যাগ করিলেন। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল। তৎক্ষণাৎ অপর দুইজনে হেমচন্দ্রের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিল। তত্দূর অধঃপর্যন্ত হস্ত সঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল

নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। সেই আঘাতপ্রাপ্তিমাত্র সেই রমণীর ঘোটক মুমূর্ষু হইয়া ভূতলে পড়িল।

হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ করাল শূল উন্নত করিয়া কহিলেন, "আমার পিতৃদত্ত শূল শত্রুরক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।—ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সে-ই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। মোচনমাত্র অতিশয় শোণিতস্রুতি হইতে লাগিল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি-হেতু দুর্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে গমনের অদ্য আর কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব অপ্রসন্নমনে ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটীরের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠরক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—চেতনা অপহৃত হইল।

১১

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটীরমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত; অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশু-সন্তানসকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। সেই দুইটি স্ত্রীলোক —মৃণালিনী আর গিরিজায়া, নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া এইস্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

প্রভাতে প্রথমে রত্নময়ী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"সই ?"

গিরি। কি সই ?

রত্ন। তুমি কোথা সই ?

গিরি। বিছানায় সই

রত্ন। উঠ না সই !

গিরি। না সই।

রত্ন। গায়ে জল দিব সই।

গিরি। জল সই ? ভাল সই, তাও সই।

রত্ন। নহিলে ছাড়ি কই ?

গিরি। ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই ?—তোমায় না কইলে আর কারে কই ?

রত্ন। কথায় সই, তুমি চিরজই ; আমি তোমার কাছে বোবা হই, আর মিলাইতে পারি কই ?

গিরি। আরও মিল চাই ?

রত্ন। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্মে গেল। মৃণালিনী এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"ঠাকুরানী, জাগিয়াছ ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই থাকি।"

গিরি। কি ভাবিতেছিলে ?

মৃণা। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগর-মধ্যে আছেন ; এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

এমন সময়ে রত্নময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদিগের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য পুরুষ।"

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্যন্ত আসিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গে যাই।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।...

হেমচন্দ্র গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা আকাশমার্গে স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন।

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "মনোরমা, এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মনোরমা, কি হইয়াছে?"

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎকাল পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ?"

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেলেন। একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের রুধির-সকল ধৌত করিলেন এবং নব-দূর্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দন্তে চর্বিত করিলেন। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিলেন। তখন কহিলেন, "হেমচন্দ্র, তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী মনোরমার কার্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন, সংবাদ লইয়া যাইও।"…

মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া হেমচন্দ্রের শয়নকক্ষের বাতায়নতলে আসিয়া উপবেশন করিল—অভিপ্রায়, হেমচন্দ্র-মনোরমার কি কথোপকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই তো হয় না। একাকী নীরবে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই কষ্ট।

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে?"

হেম। বেশ ঘুম হয়েছে।

মনো। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাসা শেষ হইল। এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল বল।"

মনোরমা মৃদু মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিল। গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না।

তখন গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিল, "ভিক্ষা দাও গো।"

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "এ কি! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর! আমি চলিলাম।" এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যস্তস্বরে কহিলেন, "এ কি, গিরিজায়া! তুমি এখানে কবে আসিলে?"

গিরি। আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।

হেম। মৃণালিনী কেমন আছেন, দেখিয়া আসিয়াছ?

গিরি। মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার স্কন্ধস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইল—গিরিজায়া তাহা দেখিতে পাইল না। হেমচন্দ্র বলিলেন, "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, "হায়, কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম!—এখন ঠাকুরানীর দশা কি হইবে?"

হেমচন্দ্র যে অভিমানাধিক্যে, দুর্দম ক্রোধাবেগে গিরিজায়াকে বলিলেন,

"তোমার সংবাদ শুভ", গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না ; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না ; গৃহাভিমুখে চলিল।

১২

সেই দিন মাধবাচার্যের পর্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্রের নিকট আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবাচার্য কহিলেন, "এত শ্রম করিয়া কতকদূর কৃতকার্য হইয়াছি। অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন-রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাঁহারা অদ্যই এ স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সেনা আসিয়াছে, আজিকালি নগর আক্রমণ করিবে।

মাধবাচার্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে ?"

হেম। কিছুই না। বোধ হয়, রাজ-সন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন ?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক আহত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি।

মা। তুমি বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, আপনি গৌড় গমন করিয়াছিলেন—"

মাধবাচার্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। মৃণালিনী তথায় নাই।"

হে। কোথায় গিয়াছে ?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে ?

মা। বৎস, সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "আমি কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

তখন মাধবাচার্য হৃষীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইলেন। হেমচন্দ্র অধোমুখে নিঃশব্দে সমুদয় শুনিলেন। মাধবাচার্যের কথা সমাপ্ত হইলেও সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, "বৎস, মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও।"

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্যও ভীত হইলেন।—হেমচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে, ভিখারিনী আর এক প্রকার বলিল।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "ভিখারিনী কে? সে কি বলিয়াছে?"

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য সঙ্কুচিত-স্বরে কহিলেন, "হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া, ভীত হইয়া অপসৃত হইলেন।...

অপরাহ্ণে মাধবাচার্য প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহারা দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের

আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য কহিলেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কিনা, সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিলেন, "ভাই, আজ তুমি কেন এত কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?" হেমচন্দ্র কহিলেন, "কিছু না।"

মনোরমা হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কিছু না—বলিবে না। —আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।"

হে। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরের অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নিতান্ত কাতরতাপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই নাই। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, তাহা এখন ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। তিনি কহিলেন, "বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "ভালবাসিতাম।"—অমনি নীরবে নিস্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "ছি! ছি! প্রতারণা। যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম ?"

মনোরমা কহিলেন, "ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন ?"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন।

১৩

গিরিজায়া পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্তত করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। তিনি কি কহিলেন ?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্তত করিয়া উত্তর দিতেছ। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না। আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে'; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন ?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত। আমি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।"—গিরিজায়া স্বীকৃত হইল।

মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন।—

"গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি।"

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "পত্র কাহার?"

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল?"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হেমচন্দ্র লিপিখানা না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখণ্ড-সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক্, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিনীর গর্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

১৪

হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। মৃণালিনী কোথায়? তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন! তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

বাপীতীরে যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তথায় আসিলেন। মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টি লোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পুরিয়া গেল। তিনি হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর হস্তধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন। মৃণালিনী আবার রোদন করিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী, আমি তোমার নিকটে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।"

মৃণালিনী কহিলেন, "কি?"

হেম। তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে কেন?

ঐ নাম শুনিবামাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "হৃষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে।"

হেমচন্দ্র অল্প সন্দিহান হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল?"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষচ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

"পাপীয়সী, নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন।

১৫

নিশীথসময়ে নিভৃতে বসিয়া ধর্মাধিকার পশুপতি নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শান্তশীলকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল, প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।"

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয়জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্মা উপদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছেন কি না ?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য নির্বাহ করিয়াছেন। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অদ্য রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। তাহার পর ?

শা। গৌড়জয় ও রাজ্যনাশ নিশ্চিত বুঝিয়া রাজা রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।" তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ, ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্মাধিকারের প্রতি রাজকার্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, আপনার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।" রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। এখন আমার মনস্কামনা-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে বিদায় হও।

শান্তশীল বিদায় হইল।...

পশুপতি, শয়নের পূর্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণামবন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছেন। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, কখন আসিলে ?"

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিলেন। কথার কোন উত্তর দিলেন না। পশুপতি কহিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, "আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"

পশুপতি কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কিনা ?

মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "পশুপতি, কেশবের কন্যা কোথায় ?"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের মেয়ে কোথায় জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।"

মনো। আমি জানি, কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক্ হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিলেন, "একজন জ্যোতির্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যু-

সংবাদ কস্মিনকালে না পাইতে পারে। কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। আচার্যকে সবিশেষ কহিয়া বলিলেন, 'আপনি এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাহার স্ত্রী।'—আচার্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া প্রতিপালন করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

পশু। এখন সে কন্যা কোথায়?

মনো। আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দন শর্মা তাঁহার আচার্য। একদিন ব্রাহ্মণ গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন, আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছি।

পশু। ভাল, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিলেন, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি, আমি যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি, শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্য-লাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত-চেষ্টা ছাড়। চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—"

পশু। নহিলে কি?

মনো। নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

প। মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা, আমি

যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেকদূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে। তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাহাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।

এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "মনোরমা, আজ আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"—মনোরমা-বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল।

১৬

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিত-লোচনে দেখিল, কোন অপরিচিত জাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের যোদ্ধবেশ।

যবন-রাজার দূত পরিচয়ে সপ্তদশ অশ্বারোহী নির্বিঘ্নে রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবনরাজপ্রতিনিধির দূত, গৌড়-রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্বাগ্রে একজন খর্বকায়, দীর্ঘবাহু, কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশতঃ

দৌবারিক তাহার গতিরোধ জন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন দৌবারিককে নিজ করস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকার যবন কহিল, "এক্ষণে আপন আপন কার্য কর।" অমনি কটিবন্ধ হইতে অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকার যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসিদ্বারা ছিন্নমস্তক বা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্তনাদ করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবনেরা সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্ক শরীর জলস্রোত প্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন—কহিলেন, "চিন্তা নাই—আপনি উঠুন। নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কীদ্বার দিয়া সোনারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কীদ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিলেন।...

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখ্‌তিয়ার ধর্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন।

পশুপতি যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখ্‌তিয়ার গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কহিলেন, "কুতবুদ্দীন গৌড়শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু আপনাকে ইস্‌লামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে।"

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, "সন্ধির সময়ে এরূপ কোন কথা হয় নাই।"

বক্তি। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আপনি যবনধর্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

পশু। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবনসম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

বক্তি। ইহা আপনার ভ্রম। কোরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন, সন্ধি ছলক্রমে না পারিলে বলক্রমে ভঙ্গ করিবে। তিনি ক্ষণেক চিন্তার পর কাপট্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি আজ্ঞানুবর্তী হইব।"

বখ্‌তিয়ারও তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। কহিলেন, "ভাল, ভাল। আমাদিগের পুরোহিত এখনই আপনাকে ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত করিবেন।"

পশুপতি দেখিলেন, সর্বনাশ! বলিলেন, "একবারমাত্র অবকাশ

দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।”

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, “আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।”

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল। পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম?”

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, “আপাততঃ তাহাই বটে।”

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন।

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল।

১৭

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিলেন না। তখন উন্মাদিনী মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিলেন। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া মনোরমা গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্যন্ত বাহির করিয়া দিলেন। গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিলেন। মনোরমা তাহা ধারণ করিলেন এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ গবাক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিলেন। কোমল শাখা তাঁহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাঁহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্তী হইল। মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িলেন এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দনের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

১৮

সেই নিশীথে নবদ্বীপনগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শোণিতে গৃহস্থের গৃহ-সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে হেমচন্দ্র আপন গৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ ?"

দিগ্বিজয় কহিল, "যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্যন্ত বখ্‌তিয়ার কর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের কথা শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র তখন রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং ভীষণ শূলহস্তে সেই অসীম যবনসেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণ-কালে বিনাযুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া হেমচন্দ্র সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহমধ্যে যবন

নাই। কিন্তু যবনদৌরাত্ম্যের চিহ্নসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই; যাহা আছে, তাহার ভগ্নাবস্থা; আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে—তাহার মৃত্যু আসন্ন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জল! জল! পিশাচী!—সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "না! না! যবনের জল খাইব না।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পার।"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে? আর কি? সেই রাক্ষসীকে —বলিও—বলিও—আমার অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব?

ব্রাহ্মণ। কে সে—পিশাচী! মৃণালিনী—পিশাচী।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে?

ব্রা। কি করিয়াছে?—কিছু না—আমি—আমি তার দুর্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হে। তোমার নাম কি?

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথা?"

ব্রা। গৌড়ে—গৌড় জান না? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

হে। তার পর?

ব্রা। তার পর—তার পর আমার এই দশা—মৃণালিনী—বড় নির্দয়—আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া পিতার নিকট তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনাদোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী—রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল। সেই—সেই অবধি আমার সর্বস্বত্যাগ। তাহার জন্য কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি? নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম—যবন—যবনহস্তে মরিলাম—আমার পাপের ফল ফলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না—আর যবন বধ করিলেন না—কোনমতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

১৯

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃণালিনী এখনও সেইখানে। নিশা প্রভাত হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিল—মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল। নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্বাচলের সূর্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য পশ্চিমাকাশে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিল যে, তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইল। বলিল, "রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?"

মৃ। গিরিজায়া, হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে বলিল, "কি ঠাকুরানী, তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী!"

মৃ। গিরিজায়া—তিনি, রাজপুত্র—আমার স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?—হাজার বার বলিব। কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?"

মৃ। সে আমারই দোষ। আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরানী, এ সংসারে তুমিই সুখী।"...

ক্ষণেক পরে গিরিজায়া কহিল, "গৃহে চল।" মৃণালিনী বলিলেন, "নগরে এ কিসের গোলযোগ?" তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। কিন্তু দুইজন রাজ-পথের নিকট পর্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায় নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন। গিরিজায়া বলিল, "যদি এখানে উহারা আইসে?"

মৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই বলিল, "বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব—কেহ দেখিতে পাইবে না।"

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্বনাশ উপস্থিত হইল।"

গি। সে কি?

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র।—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে—না জানি, কি বিপদে পড়িবেন।

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীও একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্বল—তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাঁহারও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাতে কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মৃণালিনীকে যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু, অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" সেই কণ্ঠস্বরে যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—যাহা দেখিলেন তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন, সত্য হেমচন্দ্র সম্মুখে; হেমচন্দ্র বলিতেছেন, "আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

নিরভিমানিনী মৃণালিনী তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।···

মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া হেমচন্দ্র উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। গিরিজায়া অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবন-বাটিকায় আসিয়া হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী—উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা-সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।···

এ দিকে দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল। মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আসিলেন, তখন সে

দেখিয়া চিনিল। ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল, দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল, "বুঝিয়াছি—ইহারা দুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের দুই-জনকে দেখিতে আসিয়াছে।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপদাড়ি চুমরিয়া লইল। আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই দুষ্ট—এক দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি তো শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটু শুই। দেখি, গিরিজায়া আমাকে খুঁজিয়া নেয় কিনা?" ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্ দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ মলো, ঘর-গুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি? এক মিন্‌সে! চোর নাকি? মলো মিন্‌সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জনীর আঘাত।

"ও গিরিজায়া, আমি! আমি! আমি দিগ্বিজয়!"

"আবার চুরি করিতে এসে—আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্‌সে?" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় একবার সকাতরে বলিল, "গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্‌সে!"

দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

২০

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল। যে আলাপ হইল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এতদিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্য?"

মৃ। এতদিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এ জন্য প্রকাশ করি নাই।

গি। ঠাকুরানী, সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার পিতা একজন বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সহিত নৌকায় যমুনায় জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তিনিই হেমচন্দ্র—তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতে-ছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্দ্র তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার

বয়স পনের বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন। অরুন্ধতী নামে আমার এক মাসী ছিলেন। তিনি আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দিগ্বিজয় ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত, আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন।"

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, "ঠাকুরানী, আমি একটি বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, ওটা অতি অপদার্থ। এ জন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ঘা কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা ভাল করি নাই।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

গি। তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি করি?

মৃণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজ তোমার গায়ে হলুদ দিব।"

২১

হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন ?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "বৎস, দুঃখিত হইও না। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। কিন্তু গৌড়রাজ্য তো প্রকৃত পূর্ব নহে—কামরূপই পূর্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।—তুমি আমার সঙ্গে কামরূপ চল।"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?"

মাধবাচার্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি ? আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে।"

হেমচন্দ্র পূর্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মাধবাচার্য চমৎকৃত হইলেন; রুষ্ট হইলেন; ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছু জানিলাম না ?"

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "বৎস, বড় প্রীত হইলাম। আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্মাচরণ কর। এক্ষণে তোমাকে আমি কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি; যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের নিকট বিদায় হইলেন।

২২

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল; মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন, "যবন, প্রিয়সম্ভাষণে আর আবশ্যক নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি।"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে।"

পশু। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিধান করিব?

মহ। আপনি ইচ্ছাপূর্বক না পরিলে, আপনাকে বলপূর্বক পরাইব।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন মহম্মদ আলি কহিলেন, "ধর্মাধিকার, আপনি আমাকে বিনাদোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি এই রাত্রির মধ্যে যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল

বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিতসিক্ত কর্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহু গৃহ ভস্মীভূত।...এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই।...সহসা এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ বাটী? তাহা কি যবন-হস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে মনোরমার কি দশা হইয়াছে? এ যবনসেনাপ্রবাহে সে না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবন-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই।—তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত-নয়নে দহ্যমান অট্টালিকাপ্রতি চাহিয়া রহিলেন—শেষে মহাবেগে জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল— কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধশরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন দেবীর মন্দিরপ্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,

অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, "মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। মা, এক দিনের পাপে সব হারাইলাম! তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম?—চল, ইষ্টদেবী! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে ধারণ করিলেন। সেই সময়ে অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পর্বত-বিদারণের ন্যায় প্রবল শব্দ হইল—দগ্ধ মন্দির আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির জীবন্ত সমাধি হইল।

২৩

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহার সেবার জন্য দুর্গাদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পরদিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার গৃহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি পশুপতির ভবনে গমন করিয়া যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। পিতাপুত্রে বহুকষ্টে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে—এ কি? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, পশুপতির মৃতদেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুই জনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া

চিতা রচনা করিলেন এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িত-কুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্তিনী হইলেন। দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

রমণী কহিলেন, "তোমরা কাহার সংকার করিতেছ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্মাধিকার পশুপতির।—আপনি কে?"

তরুণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পত্নী।"

দুর্গাদাস কহিলেন, "তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা। আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী?"

যুবতী কহিলেন, "আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুমরণ ভয়ে পিতা আমাকে এত কাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ বিধিলিপি পূরাইবার জন্য আসিয়াছি। তোমরা উদ্যোগ কর।"

শুনিয়া পিতাপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন। দুর্গাদাস কহিলেন, "মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ?"

তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?—ইহার উদ্যোগ কর।"

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজনের জন্য নগরে চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, "তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবন বাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে—তিনি আসিয়া একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন।"

হেমচন্দ্র দুর্গাদাসের সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার

অতি মলিনা উন্মাদিনী মূর্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মনোরমা ! ভগিনী ! এ কি এ ?"

তখন মনোরমা স্থিরমূর্তিতে মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিও—নচেৎ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দন শর্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। আমার দাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও। আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁজিলেই তাহা পাইবে।" এই বলিয়া মনোরমা যেখানে অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। মনোরমা নববস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং সহাস্যবদনে হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

২৪

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিয়দংশ জনার্দনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্তব্য কিনা, তাহা মাধবাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তুমি এই ধনের দ্বারা তথায়

নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর এবং যবনদমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসাধন করিও।

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কার্য হইয়া উঠিল, কেন না, যবন-দিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল। এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্তিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।
